BALLY RIVERS THOMPSON SCHOOL.

SESSION 193 .

This book is awarded to

....

of   *Class, being the*   *prize*

for general proficiency.

BALLY,   **Jyotsna Kumar Banerjee,**

The ... ... *193* .   *Hon. Secretary.*

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অষ্টম সংখ্যা

সবুজ কি অবুঝ?

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

বেঙ্গল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটী
৯৯।১এফ্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা

মূল্য ১৷০
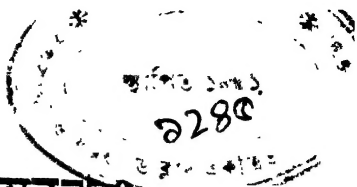
প্রকাশক—
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এস, সি
৯৯।১ এফ্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভূমিকা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রন্থমালার অষ্টম গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই অপরিমেয় সৃষ্টির সকল পর্ব্বেই একই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। একই হাতের কাজ, উহা তাহারই প্রমাণ। শানাইয়ের অপূর্ব্ব সুরের লীলার একমাত্র আশ্রয় হইল উহার একটানা পোঁ ধ্বনি, এই সত্যটি সুরবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া যেন আমরা না ভুলি। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে সেই একটানা সুরের সন্ধানের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থমালা লেখার উদ্যোগ। তাঁহার অখণ্ড সৃষ্টি অখণ্ড দৃষ্টিতেই দেখা উচিত।

৭ম খণ্ডের ন্যায় এইটির চিত্রও আঁকিয়াছেন স্নেহাস্পদ শ্রীমান ক্ষেত্রমোহন ধর।

বাঙ্গালা ভাষায় গল্প উপন্যাসের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, আমার এরূপ প্রচেষ্টা পাঠক সমাজের কতদূর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে জানিনা। তবে ব্রত হিসাবে ইহা আরম্ভ করিয়াছি এবং ব্রত হিসাবেই ইহা শেষ করিবার ইচ্ছা আছে।

রাখীপূর্ণিমা ১৩৫২

ইতি—

গ্রন্থকার

সূচী

সবুজ কি অবুঝ ?

১

সবুজ কি সত্যই অবুঝ ?

উদ্ভিদ কি প্রাণহীন ? ইহার কি চেতনা নাই ; না ইহার কোন কার্য্যক্ষম ইন্দ্রিয় নাই ? প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহার উত্তর পাওয়া সম্ভব।

(১) প্রাণীর ছানার (শিশু) মতই পিতামাতার আকার ও প্রকৃতি উদ্ভিদের চারাও লাভ করে। আম গাছের বীজে (আমের আঁটি)—আম চারাই জন্মায়, কদাচ আমড়া চারা জন্মিতে দেখা যায় না। উদ্ভিদও প্রাণবন্ত আধার, ইহার জন্ম ও মৃত্যু আছে। ইহার উপরেও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব পড়িতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে চারা সবল ও সুস্থ হইয়া বাড়িতে থাকে। সুস্থ সবল মানুষের মুখের হাসি দেখিলেই—যেমন তাহার আনন্দময় স্বাস্থ্যকর জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ঠিক সেইরূপই সবুজ যে তাহার পারিপার্শ্বিকে সুখী তাহা তাহার সুন্দর পত্রগুচ্ছ ও মনোহর পুষ্পদল দেখিলেই টের পাওয়া যায়।

(২) জীবন্ত আধার মাত্রেরই বাঁচিবার জন্য বায়ুর একান্ত প্রয়োজন। উদ্ভিদের পক্ষেও ইহা খাটে। বায়ুর অভাবে, আমাদের মতই, চারাগাছ ত মরিয়া যায়ই, বড় বড় গাছও শুকাইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। আবার মুমূর্ষু গাছের গোড়া কোপাইয়া বায়ু প্রবেশের পথ করিয়া দিলে, উহা

অচিরেই বেশ তাজা হইয়া উঠে। বিভিন্ন জীবাধারে নিশ্বাস লইবার পদ্ধতি ভিন্ন প্রকারের ; নানা জীব নানা প্রকার দ্বার দিয়া বায়ু গ্রহণ করে। আমরা বায়ু গ্রহণ করি নাসিকা দিয়া ; মাছ করে তাহার কান্‌কোর সাহায্যে ; উদ্ভিদ করে তাহার অসংখ্য দ্বার দিয়া। এই দ্বারগুলি এতই সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণের সাহায্য বিনা দেখা যায় না। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত উদ্ভিদের শ্বাস প্রশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন আমাদের মতই।

(৩) প্রাণী মাত্রেই বাঁচিবার ও বাড়িবার জন্য আহারের প্রয়োজন, উদ্ভিদেরও তাই। অবশ্য আহার ও তাহার গ্রহণ বিধি নানা জীবাধারে নানা প্রকারের। উন্নত জীবাধার অন্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করে, অনুন্নত জীবাধার বেচারাকে আপন আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রকৃতির এই ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থারই অনুরূপ। উদ্ভিদ অনুন্নত জীবাধার, উহাকে আপন প্রয়োজন মত আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উদ্ভিদ জল, বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ লইয়া প্রথমতঃ সৌর তেজে পাক করিয়া উপযোগী খাদ্যে পরিণত করে ; তাহার পর উহা গ্রহণ করিয়া আপন দেহ গঠনে লাগায়। আহারের উপাদান ও গ্রহণ বিধি ভিন্ন হইলেও যে আহার্য্য উদ্ভিদকে বাঁচায়, বাড়ায় ; উহাই ক্রমোন্নত জীবাধারগুলিকেও পুষ্টি দান করে।

(৪) উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি একই ধরণে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষনিচয়ে গঠিত হয় এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহিত কোষগুলির সংখ্যা বাড়ে, কোষগুলির আকার কিন্তু সেইই থাকে। কোষগুলি বড় হইয়া জীবাধার বড় হয় না, কোষগুলির সংখ্যা বাড়িয়া জীবাধার বড় হয়।

(৫) প্রাণীর মতই উদ্ভিদের আত্মরক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণী জগতে যেমন মানুষের মুষ্টি, বিড়ালের নখ,

কুকুরের দাঁত, মৌমাছির হুল, ঠিক তেমনি উদ্ভিদ্ জগতে জল বিছুটি গাছের বিষাক্ত কেশ, কুলের কাঁটা, আনারসের করাতের মত পাতা ইত্যাদি ব্যবস্থা আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ।

(৬) সবুজের জীবনযুদ্ধ প্রাণী জগতের মতই নির্ম্মম ও ভীষণ। বাগান কিছুদিন ধরিয়া অযত্নে ফেলিয়া রাখিলেই আগাছা জন্মিয়া সযত্ন রক্ষিত সুখী ফুলগাছগুলিকে প্রথমতঃ মারিয়া ফেলিবে; তাহার পর অন্যান্য গাছ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে।

(৭) প্রাণী জগতে বংশবিস্তার নরনারীর মিলনের ফলে ঘটিয়া থাকে। উদ্ভিদ জগতেও ঠিক তাহাই হয়; নর ও নারী সবুজের মিলনের ফলে উহার বংশবিস্তার ঘটে। তবে সবুজের চলৎশক্তি না থাকায় উহাদের অভীষ্ট মিলন বায়ু ও মৌমাছি, প্রজাপতি আদি কীট পতঙ্গের সাহায্যে ঘটে।

(৮) প্রাণী জগতে সন্তান রক্ষার যে যত্ন ও চেষ্টা দেখা যায়, উদ্ভিদ জগতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। উহারা আপনার ফল বা বীজ নানা উপায়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। নারিকেল গাছ আপন বীজের উপর এমন দৃঢ় আবরণ দেয় যে উহা সাধারণ শত্রু নষ্ট করিতে পারে না, সর্ব্বগ্রাসী মানুষের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। উহার মধ্যে নারিকেল ভ্রূণের জন্য আহার ও জলের ব্যবস্থা থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে উহা বহুদিন আত্মরক্ষা করিয়া সুযোগমত নারিকেল চারারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। শুঁটি জাতীয় বীজ পাকিলে বীজাধার ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে এমনই ছড়াইয়া পড়ে যে পশু পক্ষী খাইয়া ফেলিলেও কোথাও না কোথাও একাধিক বীজ দৃঢ় আবরণের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে এবং সুযোগ মত চারারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

(৯) প্রাণীর জীবনযাত্রায় বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সবুজের জীবন যাত্রায় এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সে দিনের বেলায় আপন

কারখানায়—পত্রে পত্রে—সৌর তেজের সাহায্যে জল, বায়ু ও মৃত্তিকা মধ্যস্থ উপাদান পাক করিয়া আপন প্রযোজন মত খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকে এবং রাত্রে কারখানা বন্ধ করিয়া আমাদের মতই নিদ্রাসুখ উপভোগ করে।

(১০) জীবন যুদ্ধে যেমন সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায় কালোপযোগী প্রাণীই জয়ী হয়, অন্যান্য প্রাণী ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; ঠিক সেইরূপ উদ্ভিদ্ জগতেও নির্ম্মম জীবন-যুদ্ধের পরিণাম অনুরূপই ঘটিয়া থাকে। একই স্থানে ঘন করিয়া বীজ রোপন করিলে বহু চারা জন্মিলেও শেষ পর্য্যন্ত সবল চারাগুলিই বাঁচিয়া থাকে, বাকিগুলি অকালে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়। উহারা ত উন্নত জীবাধারের মত পলাইয়া বাঁচিতে পারে না, একই স্থানে দাঁড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট খাদ্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া বাঁচিতে হইলে সবল চারাগুলির বাঁচিবার সম্ভাবনাই অধিক।

নানা দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় সবুজ মোটেই অবুঝ নয়। ইহার জীবনযাত্রার বহু কার্য্যে এমন সব ব্যবস্থা দৃষ্টিতে পড়ে যে সেগুলি দেখিলে মনে হয় সবুজ প্রাণবন্ত বুদ্ধিমান জীব। তাই স্বতঃই মনে উঠে,

রূপ হ'তে রূপে
বহ চুপে চুপে,
ওগো চিরন্তন।

২

মাটি নয় 'মা' টি

আমাদের মত গাছ পালার আহার, বায়ু, আলো ও জলের প্রয়োজন। এই গুলি ঠিক ঠিক না পাইলে, আমাদের মতই গাছপালাও কালোপযোগী বাড়িতে পারে না; রুগ্ন হইয়া পড়ে, ভাল ফল দেয় না এবং অকালে মরিয়া যায়।

আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে সময়োপযোগী টাট্‌কা নিরোগ আহার্য্যের উপর; ইহার অভাবেই বিশেষ করিয়া নাগরিকদিগের মধ্যে নানা রোগ প্রায়ই দেখা যায়। আহার্য্যের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে নির্দ্দোষ বীজ ও উপযুক্ত সারাল ক্ষেতের উপর। আবার সারাল ক্ষেতের অভাবে নির্দ্দোষ বীজ হইতেও রুগ্ন গাছ জন্মে।

শেষ পর্য্যন্ত সারাল ক্ষেতের উপরেই আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। সারাল ক্ষেত মানে নির্দ্দোষ প্রাণবন্ত পরিপুষ্ট ক্ষেত, যাহার বুকে নির্দ্দোষ বীজ হইতে পরিপুষ্ট তেজাল প্রাণবন্ত গাছপালার বিকাশ ঘটিতে পারে। আগাগোড়া বিচার করিলে দেখা যায় ক্ষেত হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকল আধারেই প্রাণের একটা অবিচ্ছিন্ন লীলা চলিয়াছে। প্রাণাধারগুলির মধ্যে কোনটী যদি নির্দ্দোষ না হয়, তাহা হইলে মানুষ পর্য্যন্ত উহার প্রতিক্রিয়া পৌছিতে বিলম্ব ঘটে না।

ক্ষেতকে আমরা প্রাণবন্ত বলিয়া ধরি না বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। ক্ষেতকে প্রাণবন্ত আধারের মত সেবা, যত্ন, উপযুক্ত আহার্য্য না দিলে উহা দিনে দিনে রুগ্ন হইয়া পড়ে, ফলে শেষ পর্য্যন্ত মানব সমাজেও নানা রোগ দেখা দেয়। প্রাণবন্ত আধারের আহার্য্য তাজা প্রাণবন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেহের পুষ্টির অভাবে দেহে নানা রোগ দেখা দেয়, ক্ষেতের বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে। প্রকৃতি দেবী কিরূপ আহারের ব্যবস্থা করিয়া বনভূমি সৃষ্টি করেন সেইটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ক্ষেতের আহার্য্যের কতকটা ধারণা জন্মিবে।

বনভূমিতে যে গাছ জন্মে, উহা হইতে পাতা খসিয়া পড়িয়া বনভূমি ছাইয়া ফেলে। উহার উপর নানা পোকা, মাকড়, কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষী চরিয়া বেড়ায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। বর্ষাকালে জল পড়িয়া এইগুলি পচিয়া উঠিয়া ভূমির উপর একটা নরম হালকা সচ্ছিদ্র স্তর গড়িয়া তুলে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটির উপর একটি স্তর গড়িয়া উঠিতেছে।

বনে গাছের আচ্ছাদন থাকায় বৃষ্টির ধারা এই হাল্কা স্তরের উপরে বেগে পড়িয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। সঞ্চিত জলের ক্ষীণ-স্রোতে উহার সামান্য অংশ মাত্র বাহিত হইয়া নিম্নভূমিতে গিয়া পড়ে এবং উহাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে। এই কারণে বনঢল ভূমি এত উর্ব্বরা।

এই হাল্কা সচ্ছিদ্র আচ্ছাদনের স্তরে স্তরে থাকে অসংখ্য জীবাণু। উহাদিগের জীবন লীলায় গাছের গোড়া পায় প্রাণের খোরাক। এই আচ্ছাদন হাল্কা ও সচ্ছিদ্র বলিয়া বায়ু সহজেই প্রবেশ পথ পায়। এই উপাদানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ধারণ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ, ফলে গ্রীষ্মকালেও জলের অভাব ঘটে না।

মাটিতে পড়িয়া সব উপাদানই কালে মাটিতে পরিণত হয়। এই হাল্কা উপাদানকে আমরা সার মাটি (humus) বলিব। ইহার লক্ষণ ও ধর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) ইহার রং কাল্‌চেটে ধূসর হইতে শুদ্ধ কাল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(২) ইহা জলে গোলে না, তবে পরিষ্কার জলের সহিত মাখিলে একটা আঠাল পদার্থে পরিণত হয়।

(৩) সার মাটিতে অঙ্গারের ভাগ উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণুর আধার-গত অঙ্গারের ভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী। সার মাটিতে প্রায় আধাআধির অপেক্ষা বেশী অঙ্গার থাকে।

(৪) সার মাটীতে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে।

(৫) সার মাটির আবর্জ্জনার মত নিষ্ক্রিয় মৃতবৎ অবস্থা নয়, বরং ইহাকে সক্রিয় জীবন্ত বলা চলে। ইহার উৎপত্তি প্রাণবন্ত আধারেব পরিত্যক্ত অংশ হইতে এবং ইহার মধ্যে নানা আণবিক জীবাণুসংঘের একটা অবিরাম লীলা চলিতেছে। অণুজীবেরা ইহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিযা নূতন রূপ দেওয়ায় ইহা নানা নূতন গুণ গ্রহণ করে। এইরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময ইহা হইতে ক্রমাগত য্যামোনিয়া ও কার্বন-দ্বি-অক্সাইড বাহির হইতে থাকে।

(৬) সার মাটির ক্ষেতের অন্যান্য উপাদানের সহিত মিশিবার শক্তি অসাধারণ। ইহার জল ধারণের ক্ষমতা প্রচুর। ইহার ফলে ইহা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, সেইজন্য ইহার মধ্যে বায়ু চলাচলের অনেক সুবিধা হয়। এইরূপ নানা গুণের জন্য ইহাকে উদ্ভিদ জাতীয প্রাণের বিকাশের ও পুষ্টির অনুকূল আধারের একটা প্রধান উপাদান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতি দেবীর কার্য্যে কোথাও অপচয় নাই; এক জীবাধার যাহা অপ্রয়োজন বোধে মলমূত্ররূপে ত্যাগ করে, অপর জীবাধারের উহাই পুষ্টির খোরাক জোটায়। প্রকৃতি রাজ্যে এই যে এক প্রাণাধার হইতে আর এক প্রাণাধারের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন আদান প্রদানের যোগ দেখা যায়, উহা ছিন্ন করিলে খাদ্যাভাবে ছিন্ন অংশের আশপাশের আধারে রোগ দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ এই রোগ প্রাণচক্রের প্রতি অংশে সংক্রামিত হইযা পড়ে। আদি অন্তহীন সৃষ্টিচক্রের কোন অংশে চক্রের বিকাশের প্রতিকূল কোন ঘটনা ঘটিলে সেই অংশকে সরাইয়া ফেলিয়া ঐ চক্রে সমতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য রোগ নিযুক্ত হয। রোগের কাজ

মারিয়া বাঁচান। আপাত দৃষ্টিতে রোগ ব্যষ্টির পক্ষে শত্রু হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা সমষ্টির পক্ষে মিত্র।

প্রকৃতির শৃঙ্খলা আগাগোড়া লক্ষ্য করিলে ধরা পড়ে যে এই বিরাট প্রাণচক্রের—

(১) প্রতি অংশটি প্রাণবন্ত ও আপন কার্য্যোপযোগী।

(২) প্রতি অংশটির প্রাণ অপরগুলির সহিত উপযুক্ত নির্ব্বিবাদ আদানপ্রদানের উপর নির্ভর করে।

(৩) কোন কারণে কোন অংশের কার্য্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইলে অর্থাৎ উহা রুগ্ন হইলে, উহাতে যে শতকোটি অনুজীব বাঁচিয়া থাকিয়া ও মরিয়াও উহাদের প্রাণের খোরাক যোগাইতেছিল, উহারাই উহার বিলোপ সাধনের কারণ হইয়া উঠে ; তখন রক্ষক ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) এই বিরাট চক্রের কোন আধারটিবা মানুষের রূপ, কোনটিইবা গো-মহিষাদি অন্য কোন জীব, কোনটিইবা উদ্ভিদ আধার, আবার কোনটি আপাত দৃষ্টিতে প্রাণহীন মাটি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির ব্যবস্থার কোথাও অপচয় নাই। একের আবর্জ্জনা বা মল অপরের পুষ্টির কারণ। একের মরণে অপরের জীবন গড়িয়া উঠে। যে ব্যবস্থায় অপচয় দেখা যায়, উহা রুগ্ন ধরিতে হইবে। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে আত্মনাশী বীজ ধীরে ধীরে ব্যবস্থা রচনাকারীর অগোচরে প্রাণ লইতেছে ধরিতে হইবে। প্রকৃতির ব্যবস্থা স্বয়ংপূর্ণ, আত্ম-নির্ভরশীল ; মানুষের ব্যবস্থার মত নানা আমদানি রপ্তানির উপর নির্ভর করে না।

প্রকৃতির ব্যবস্থায় একটিকে বাদ দিয়া আর একটিকে জন্মাইবার কোন চেষ্টা নাই। তাঁহার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ। লতাপাতা, পোকামাকড়, জীবজন্তু, মাটি, আলো হাওয়া, সকলকেই তাঁহার ব্যবস্থায় অংশ লইতে হয়। লক্ষ্য করিলে তাঁহার ব্যবস্থায় একটা অখণ্ডতা ধরা পড়ে। মানুষ যেখানে সহজ

বুদ্ধিতে প্রকৃতিকে যতখানি সরলভাবে অনুগমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ব্যবস্থা ততখানি সফলতা লাভ করিয়াছে। চাষের বেলায়ও এই নীতি প্রযুজ্য। এরূপ চাষের নির্ব্বিঘ্ন গতির একটা স্বাভাবিক পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়।

মানুষ অতিবুদ্ধিবশে যেখানেই একটিকে বাদ দিয়া তাঁহার অখণ্ড ব্যবস্থার কোন অংশের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া উহাতে আপন মনোমত তালি দিতে গিয়াছে, সেইখানেই যত রাজ্যের ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিয়াছে। সুলভে বহুগুণ কাজ পাওয়ার লোভে প্রাণবন্ত গোমহিষাদির স্থলে অতি-বুদ্ধিমান মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রযোগে লাঙ্গল দেওয়া, শস্য কাটা, ঝাড়া আদি বহু কার্য্যই করিতে আরম্ভ করিল। তখন গোমহিষাদি একটা বিষম ভারে পরিণত হইল। কি করা যায়? মানুষ উহাদিগকে কাটিয়া খাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল আহার অভাবে শীর্ণকায় ক্ষেতে আর পূর্ব্বের মত ফসল হয় না। বৈজ্ঞানিক দল আসিয়া আপন আপন বিদ্যার গবেষণায় লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা ক্ষেতের খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন ক্ষেতে নাইট্রোজেন আদি রাসায়নিক উপাদানের অভাব ঘটিয়াছে। ব্যবসায়ী বৈজ্ঞানিকের ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষেতের খাদ্য কারখানায় প্রস্তুত করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। কৃষিজীবির মহা আনন্দ, সামান্য খরচে বহু ফসল লাভ হইল। সার ব্যবসায়ীরও লাভের খাতে মোটা টাকা জমা হইতে লাগিল।

দিন কতক পরে আর এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল। ফসলের নানা রোগ দেখা দিল; ফলে রুগ্ন ফসল সরাইবার জন্য প্রকৃতি দেবী ক্ষেতে নানা কীট পতঙ্গ পাঠাইলেন। মানুষ কিন্তু দেখিল কীট পতঙ্গের উপদ্রব; আসল ব্যাধি তাহার বুদ্ধির অগোচরেই রহিয়া গেল। ক্ষেতে এইরূপে নানা কীট পতঙ্গের মেলা বসিয়া গেল।

আবার কীটতত্ত্ববিদের ডাক পড়িল। তাঁহারা আসিয়া বহু গবেষণা করিয়া কীট পতঙ্গ মারিবার জন্য বিষের ব্যবস্থা করিলেন। যন্ত্রযোগে ক্ষেতে নানাপ্রকার বিষ ছড়ান হইল। কীট পতঙ্গ মরিল, শস্য বাঁচিল; মানুষ নিজের বুদ্ধির নিজেই প্রশংসা করিতে লাগিল। বিষের ক্রিয়ায় ফসলের শত্রু মরিল বটে, কিন্তু যাহার জন্য এই ফসল উৎপন্ন করা হইল, সে কি বাঁচিল ?

জীবের দেহ যদি খাদ্যের রূপান্তর মাত্রই হয়, তবে নির্দ্দোষ আহার্য্যে রুগ্ন দেহ হয় কি করিয়া ? আহার্য্য যদি নির্দ্দোষ, তবে এত চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন ? তবে কি বুঝিতে হইবে যে গোড়ায় গলদ ঘটিয়াছে, আহার্য্য নির্দ্দোষ নয়। পূর্ব্বে এত রোগ ছিল না, আজকাল এত বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও এত রোগ কেন ? মানুষ এত অল্পায়ু কেন ? মানুষ এত ক্ষীণবীর্য্য, বিশ্রাম প্রিয় কেন ? কই প্রকৃতির কোলে যে জীবগুলি বাড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে ত এত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না, এত জড়তার লক্ষণ দৃষ্টিতে পড়ে না।

যে মহিষ বনে লতাপাতা তৃণাদি খাইয়া পালিত এবং যে মহিষ মানুষের কাছে নানা সুখাদ্য দানা খাইয়া পালিত, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ প্রভেদ কেন ? খাদ্যের তারতম্যই কি ইহার প্রধান কারণ নয় ?

আমাদের খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক উপাদান ছাড়া একটা রহস্যময় বস্তু আছে; উহার নাম ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। ভিটামিনহীন খাদ্য গ্রহণে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না, এবং নানা রোগ দেখা দেয়; মানুষ বহু ঠেকিয়া আজ এই সত্য লাভ করিয়াছে। কারখানায় প্রস্তুত রাসায়নিক খাদ্যে উপাদান প্রাচুর্য্য থাকিলেও খাদ্যপ্রাণের একেবারেই অভাব। খাদ্যপ্রাণহীন রাসায়নিক আহার্য্য পাইয়া মাটি আমাদের মতই প্রচুর খাদ্য পাওয়া সত্ত্বেও দিন দিন প্রাণহীন হইয়া পড়ায়, যে ফসল প্রসব করেন উহা হয় রুগ্না প্রাণহীনা মায়ের সন্তানের মতই রুগ্ন ও ত্রুটিপূর্ণ।

মানুষ এ পর্য্যন্ত চাষে কোথাও গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুকে বাদ দিয়া সফলতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যেখানেই এই বিশাল প্রাণ-চক্রের কোন অংশকে অনাবশ্যক জ্ঞানে বাদ দিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই ঐ ফাঁকে নানা ফ্যাসাদ আসিয়া মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

সকল প্রাণাধারের মূল মাটিকে জড়, প্রাণহীন না মনে করিয়া প্রাণবন্ত 'মা' টি'র মত যত্ন, আদর, সেবা করিলে এবং প্রাণপূর্ণ আহার্য্য দিলে সুফল পাওয়া যায়, নচেৎ নয়। মাটিকে মায়ের মতই পানীয় ও আহার্য্য দিয়া সেবাযত্ন দিয়া পুষিলে, তিনিও মায়ের মতই অকাতরে ফসল দিয়া আমাদের আহার্য্য যোগাইবেন। এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না।

মাটির ব্যাধি

মাটির বুকেই ফসল জন্মে। মাটি রুগ্ন হইলে রুগ্ন মাতার সন্তানের মত ফসল সামান্য ও অপুষ্ট হইবে বা ফসল একেবারেই ফলিবে না। মাটির রোগের মধ্যে দুইটি প্রধান ; প্রথম সার মাটির ক্ষয়, দ্বিতীয় মাটিতে ক্ষার বাহুল্য।

(১) সার মাটির ক্ষয়

জল, ঝড়, সৌর তাপ আদি প্রাকৃতিক শক্তি সাহায্যে প্রকৃতি ক্রমাগতই উচ্চভূমি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিম্নভূমিকে উচ্চতর করিতেছেন। সৃষ্টি শৃঙ্খলায় ভাঙ্গাগড়া একই কার্য্যের দুটি দিক মাত্র। তবে প্রকৃতির পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়ার মধ্যে একটা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ধরা পড়ে। কোন

আধারে প্রাণের সর্ব্বাঙ্গ লীলার অভাব ঘটিলেই প্রকৃতি ঐ আধার অনাবশ্যক জ্ঞানে ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উহাকে নূতন আধার গড়িবার উপাদানরূপে ব্যবহার করেন।

নির্ম্মম কঠিন প্রস্তরময় ন্যাড়া পাহাড়ের চূড়াই জল ঝড়ে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভূমিতে বায়ু ও জলের স্রোতে নামিয়া আসে। ঐরূপ আধারে প্রাণের লীলা চলিতে পারে না, তাই না প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। নানা বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ পর্ব্বতভূমি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নামিয়া আসে না ত ? সেখানে যে প্রাণের লীলা নানা আধারে অবিরাম চলিতেছে ; মৃতকেই সরাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়, প্রাণবন্তকে কে কবে সরাইয়া ফেলে ?

কোন কারণে মাটির মৃত্যু ঘটিলে, যখন সেখানে প্রাণের লীলা বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়, তখনই জল, বায়ু, তাপের সাহায্যে সেই মাটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুইয়া পুঁছিয়া নিম্নভূমিতে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় মানুষ লোভের বশে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে তখন প্রকৃতি আর কোন উপায় না পাইয়া নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গার কাজে লাগিয়া পড়েন।

লোভের বশে মানুষ পাহাড়ের গা হইতে বহুদিনের বনভূমি কাটিয়া ফেলিয়া আপন সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে। উচ্চভূমির রক্ষক অপসারিত হওয়ায় জল, ঝড় ও সৌরতাপ মিত্ররূপে না আসিয়া শত্রুরূপে আসিয়া দেখা দেয় এবং ঐ স্থানের মাটি চাঁচিয়া নিম্নে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে লোভী মানুষকে শাস্তি দেওয়াও হইল এবং ঐ উপাদান হইতে নূতন কর্ষণোপযোগী ভূমি প্রস্তুত করিয়া প্রাণের লীলা বিকাশের নূতন করিয়া সুযোগ দেওয়া হইল।

নিম্নভূমিতে দেখা যায় চাষী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মাটি হইতে যে ফসল উৎপাদন করিল, উহার পরিবর্ত্তে ভূমিকে কিছুই আহার্য্য দিল না। যত্ন অভাবে, উপযুক্ত আহার্য্য ও পানীয়ের ত্রুটির ফলে মাটির মৃত্যু ঘটিল বা

মাটি অর্দ্ধমৃত হইয়া রহিল, ফলে অজন্মা দেখা দিল। লোভী অকৃতজ্ঞ চাষী দেখিল যে জমিতে পরিশ্রম ও ব্যয়ের পরিবর্ত্তে যে ফসল পাওয়া যায়, উহাতে পড়তা পোষায় না; তখন সে উহা ত্যাগ করিল। কলিকাতার গয়লা যেমন গরুর দুধের শেষ বিন্দুটুকু গ্রহণ করিয়া অনাবশ্যক বোধে কসাইয়ের হাতে উহাকে তুলিয়া দেয়, চাষীর হাতে ক্ষেতের প্রায় অনুরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিতে দেখা যায়। চাষী মরা ক্ষেতকে অনাবশ্যক জ্ঞানে ত্যাগ করিলে প্রকৃতি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন প্রাণাধার গড়িবার জন্য ব্যবহার করে। মূলকথা মাটির উর্ব্বরতা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উহার ক্ষয় আরম্ভ হয় না।

দেশ ও বিদেশের দুইটি উদাহরণ লইলে এই বিষয়টি বেশ বুঝা যাইবে। মহাচীনের পীত নদের উৎস মুখে উচ্চভূমিতে ঢালু প্রদেশের মাটি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নদের স্রোতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসার ফলে ক্রমশঃ নদের গর্ভ বুজিয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসরে এই নদের স্রোতে এত মাটি আসে যে উহাতে চারিশত বর্গমাইল ভূমি প্রায় দুই হাত উঁচু করা চলে। ক্রমশঃ নদের গর্ভদেশ উচ্চ হইতে থাকায় দুই পাশের ভূমির শস্য বন্যা হইতে বাঁচাইবার জন্য বাঁধ দিতে হইয়াছে এবং নদের গর্ভদেশ বুজিয়া গিয়া যতই উচ্চ হইতে থাকে ততই বাঁধ উচ্চ ও দৃঢ় করিতে হয়। ফলে ক্রমশঃ নদের গর্ভদেশ দুইপাশের মাঠের সমতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায় যখন কোন কারণে বাঁধে ভাঙ্গন ধরে, তখন এমন বন্যা উপস্থিত হয় যে, লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয় এবং অসংখ্য গৃহপালিত পশু ভাসিয়া যায়, সহস্র সহস্র কুটীর নষ্ট হয় এবং বহুপ্রকারে প্রজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। নিম্নভূমির সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ করিতে হইলে নদের উৎস-দেশের ক্ষয় বন্ধ করার প্রয়োজন।

নদ নদী যে উচ্চ ভূখণ্ডের বৃষ্টিপাতের নিকাশি ড্রেনরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বনভূমি একেবারে নষ্ট

হইয়া গিয়াছে এবং গৃহপালিত পশু চরিয়া উক্ত প্রদেশের তৃণভূমিও নিঃশেষে খাইয়া ফেলিযাছে। ফলে মাটির রক্ষক অপসারিত হওয়ায় জল, বায়ু ও সৌরতাপ মাটি কাটিয়া চালান দিতে পারিয়াছে। উচ্চদেশে ব্যবস্থা না করিলে নিম্নদেশে কোন ব্যবস্থা টিকিতে পারে না, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

আমাদের বাংলাদেশের দামোদর নদের মাঝে মাঝে রুদ্রমূর্ত্তির ফলে দেশে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় উহারও ঐ এক কারণ। ছোটনাগপুরের মালভূমির যে অংশের বৃষ্টির জলের নিকাশি ড্রেনরূপ দামোদরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, সেই ভূখণ্ডের চারিপাশের পাহাড়গুলি হইতে ক্রমাগত বনভূমি নির্ম্মূল করায় উহারা বৃষ্টির জলকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে। ফলে যে নদ ছিল পূর্ব্বে সংযত বারমাসিক, উহাই আজ বর্ষাকালীন খেযালী জলধারায় পরিণত হইয়া কখন কখন প্রজাকুলের নিকটে বরাভয় মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, আবার কখনও সর্ব্বনাশকর সাক্ষাৎ মহাকালরূপে উপস্থিত হয়।

জাপানে অনুরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ-ভূমি প্রদেশে স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়া নূতন নূতন বনভূমি প্রতিষ্ঠা করার ফলে বর্ষার জল ধরিয়া রাখা চলে। ঐ জল সারা বৎসর ধরিয়া অসংখ্য ঝরণা মুখে বাহির হইয়া আসিয়া মিলিত হওয়ার ফলে যে নদী প্রবাহিত হয়, উহার সংযত জলধারা বার মাস প্রজার জলের অভাব মিটাইতে পারে ; খেয়াল মত নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিবার সুযোগ পায় না।

ভারতেও গোয়ালিয়ররাজের অনুরূপ ব্যবস্থার ফলে বহু লক্ষ বিঘা অনুর্ব্বর পাহাড়ী চাষের ক্ষেত রুক্ষ বন্ধ্যারূপ ত্যাগ করিয়া শস্য শ্যামল কোমলরূপ ধারণ করিয়াছে। নদীকে খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিলে চলিবে না ; মাটি নদনদীজাত, উহার ব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে নদনদীর চিকিৎসা করা আগে প্রয়োজন। প্রকৃতি রাজ্যের প্রজার চিকিৎসা প্রকৃতির বিধি অনুযায়ী না করিলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যাইবে না।

আমাদের উচ্চ ডাঙ্গাগুলি যে বৃষ্টি ধারায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে সেখানে বর্ষাকালীন শস্যের চাষ করা প্রয়োজন। উদ্ভিদের মূলের বাঁধনে মাঠের মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া জলস্রোতে নিম্নভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। যেখানে চাষের সম্ভাবনা নাই সেখানে দূর্ব্বাঘাসের চাষ করা দরকার। জমির চারিপাশে অল্প গভীর ও চওড়া নালী কাটিয়া বর্ষার জল বহিয়া যাইবার পথ করিয়া উহাতে অন্য স্থান হইতে দূর্ব্বাঘাসের চাব্‌ড়া তুলিয়া লাগাইয়া দিলে জমির সার জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পায় না; ঘাসের আবরণ ছাঁকুনির মত ব্যবহার করে। ফলে জমির ভাসা সারে দূর্ব্বা বাড়ে এবং গো ছাগাদির আহার যোগায়। এইরূপ দূর্ব্বার বাঁধনের ফলে জমি বর্ষায় ভাঙ্গিয়া পড়ে না। চাষাকে প্রতি বৎসর ডাঙ্গা জমি মেরামত করিতে হয় না; এই উপায়ে তাহার এই পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

(২) মাটির ক্ষার বাহুল্য

মাটির ক্ষার দোষ প্রধানতঃ দুইটি কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ খালের জলে চাষ প্রথা। একবার ক্ষারদোষ ঘটিলে ছোট চাষীর পক্ষে ঐ দোষ দূর করা সম্ভব নয় এবং বড় লোক চাষীর পক্ষেও ঐরূপ কার্য্যে মজুরী পোষায় না। এই দোষ যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য গোড়া হইতেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বহুদেশ দিয়া আসিবার সময় খালের জলে ক্ষার দোষ ঘটে, এই জলে চাষ করিলে প্রথম প্রথম বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহার পর মাটির ফাঁপ কমিতে থাকে এবং মাটিতে ক্ষার জমিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বিশ পঁচিশ বৎসর পরে জমিতে এত ক্ষার জমিয়া উঠে যে তখন উহাতে আর কোন ফসল জন্মিতে পারে না।

রাসায়নিক ক্ষারবহুল সার ব্যবহারেও কালে মাটির অনুরূপ পরিণতি ঘটে। খালের জলে চাষের কুফল ভারতের মধ্যে পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশের খালের জলের ব্যবহারকারী বহু স্থানেই আজ চোখে পড়ে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের সর্ব্বনাশকর পরিণতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাজ্জ্বল্যমান।

অতিরিক্ত খালের জল ব্যবহার করিবার ফলে, মাটির প্রাণ ও বাঁধন যে জৈব উপাদান, উহা নষ্ট হয় এবং মাটির যে ফাঁকে ফাঁকে বায়ু চলাচল করিয়া উদ্ভিদ চারা বাঁচিবার পথ করে সেই গুলি জলে পূর্ণ হওয়ায় বায়ুর অভাবে মাটির মৃত্যু ঘটে। ফসলের লোভে উপযুক্ত পরিমাণে সারের যোগানর অভাব এবং জমিকে বিশ্রাম না দেওয়ায় উর্ব্বরা জমি শীঘ্রই উষর ভূমিতে পরিণত হয়। মাটির জৈব উপাদান অণুকীটসংঘ গ্রহণ করিয়া আপন দেহ গঠন করে এবং পরিশেষে ফসলে পরিণত হয়। এই হিউমাস নামীয় উপাদান ক্রমশঃ নষ্ট হওয়ায় মাটির মৃত্যু ঘটে।

৪

মানব সভ্যতায় বনের প্রভাব

জ্বালানী কাঠ, ঘরের আসবাব, ইমারতের জন্য জানালা দরজা আদি কাঠের উপাদান, দিয়াশলাই,, কাগজ, নকল রেশম (Rayon) ও জাহাজ আদি নানা মানব সভ্যতার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বনের অভাবে পাওয়া যাইত না। মানুষের সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বন কাটিয়া নূতন নূতন বাসভূমি ও চাষের ভূমি গড়িয়া উঠায় বনভূমি অনেক কমিয়া গিয়াছে। মানব সভ্যতার সারা প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া বনভূমি প্রায় উজাড় হইতে বসিয়াছে। মানব সভ্যতার নানা উপকরণ যোগাইবার জন্য

যেমন একদিকে বনভূমির প্রয়োজন, তেমনি আর একদিকে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে মানুষের জ্ঞান এত ব্যাপক না থাকায় সে যদৃচ্ছাক্রমে নিঃশেষে বন কাটিয়া ফেলিত, ফলে তাহার জীবনযাত্রায় পর্য্যন্ত উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বন নিঃশেষে কাটিয়া ফেলায় কাঠেরত অভাব হইলই, সেই বনহীন প্রদেশের আবহাওয়াতেও আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল; ফলে তদ্দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতেও আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এমন কি এই বনভূমির অভাবে একাধিক শস্যশ্যামলা, মায়ের মত কোমল, অগণিত জীব বাসোপযোগী উর্ব্বরা ভূমি কঠোর ভীতিপ্রদ নির্ম্মম জীববিরল অনুর্ব্বর মরুভূমিতে পরিণত হইতে দেখা গেল।

বর্ষাকালে বৃষ্টির অবিরাম জলধারা যখন দুর্দ্দমনীয় বেগে পাহাড়ের গা বহিয়া নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে, তখন কি ফল হইতে পারে দেখা যাউক। প্রথমতঃ নানা তৃণলতাদি সমাকীর্ণ বনভূমি যদি পাহাড়ের গা মুড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টির অবিরল ধারা লতাপাতার উপর পড়িয়া শত সহস্র কণায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পাহাড়ের গা বহিয়া শত সহস্র ক্ষীণধারায় নামিতে আরম্ভ করিবে। বনভূমির অসংখ্য গাছের অগণিত শিকড়-গুলির বাঁধনে পাহাড়ের গায়ের মাটি বাঁধিয়া থাকায়, নামিবার সময় উক্ত ক্ষীণধারা উহার কোন অংশই ভাঙ্গিয়া সঙ্গে আনিতে পারিবে না, বরং গাছগুলির শিকড়ে শিকড়ে অজস্র জলকণা বাঁধা থাকায় এবং নিম্নভূমিতে ঐগুলি ধীরে ধীরে নামায় পাহাড়ের কোলে নানা স্থানে স্ফটিকস্বচ্ছ সুপেয় জলের ঝরণা বারমাসই জীবের তৃষ্ণা মিটাইতে থাকিবে। এই গুলি হইতে উৎপন্ন নদীগুলি সংযত রুদ্ধবেগ হওয়ার ফলে খেয়ালী পাহাড়িয়া নদী না হইয়া বারমাসিক নদী হইয়া কূলবাসী জীবকুলের আনন্দের কারণ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ লতাবৃক্ষহীন ন্যাড়া পাহাড়ের অবস্থা দেখা যাউক। তখন

অবিরল বৃষ্টিধারার দুর্দ্দমনীয় বেগ ধারণ করিবার মত উদ্ভিদ না থাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হইবামাত্রই পাহাড়ের গা চাঁচিয়া নিঃশেষে সবটুকু মাটি ধুইয়া মুছিয়া সঙ্গে করিয়া নামিয়া আসে। এইরূপ শত সহস্র ক্ষুদ্রধারা পাহাড় হইতে বেগে নামিয়া আসিয়া নিম্নপ্রদেশে মিলিত হইয়া বিশালাকায় ভীষণদর্শন নদীতে পরিণত হয়। এইরূপ "নদীর তীরে যার বাস, তার ভাবনা বারমাস।" আমাদের দেশের দামোদর ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছোটনাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল নদীগুলিই তাই। এই জাতীয় নদী কয়েক মাস উৎপাত করিয়া একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন তাহার গতিপথে পড়িয়া থাকে এক বিস্তীর্ণ বালির গাদা ও স্থানে স্থানে চোরাবালির প্রাণান্তকর ফাঁদ। ইহারই মধ্যে সে তখনও কোন কোন স্থলে কোনরূপে আত্মগোপন করিয়া ক্ষীণধারায় বাঁচিয়া থাকে; অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ জলধারা শুখাইয়া যায়। অসংযত শক্তি মাত্রেরই এই একই পরিণতি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্রস্বার্থ মানুষ আপন ব্যক্তিগত আপাত সুবিধার জন্য বন কাটিয়া ফেলায় বহু স্থান আজ জীবকুলের বাসের অযোগ্য হইয়াছে। নিম্ন প্রদেশকে বার্ষিক বন্যা হইতে বাঁচাইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে আবার বাঁধ দিতে হয়। ইহাতেও রক্ষা নাই। উচ্চভূমির মাটি নদীর জলে ক্রমাগত ভাসিয়া আসায় নদীর গর্ভদেশ উঁচু হইতে থাকে, ফলে বাঁধ উঁচু করিতে হয়, কিংবা গর্ভদেশ কুরিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়, দুইই ব্যয়সাপেক্ষ। এইরূপ নদী কালে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি করে যে উহার সমাধানে মানুষকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ যে ভূখণ্ডের বৃষ্টির জল ঐরূপ নদীরূপে নিম্নে নামিয়া আসে, ঐরূপ বৃষ্টিধরা ভূখণ্ডে (Catch-ment area) সযত্নে পুনরায় বনরোপন করা, এবং পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাঁধ দিয়া প্রথম অবস্থায় ঐ শিশু-বনভূমি রক্ষা করা। জাপানে এই প্রথায় নিম্ন ভূমির ধানের জমিগুলি রক্ষা করা হয়।

সমতল ভূমিতেও বনের অভাবে অনুরূপ ফল হয়। ক্ষেতের চারিপাশে আল দিবার প্রথা ইহার একটা উপায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে চাষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মাটি অসংখ্য আলের জন্যই বৃষ্টির জলের সহিত নামিয়া আসিতে পারে না। উৎপন্ন ফসলের শিকড়গুলিও মাটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া কতক রক্ষা করে।

আজকাল মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়াছে। এই জন্য প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থায় বনরক্ষা একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ফলে বহু স্থানে মরুভূমির গ্রাস হইতে ভূখণ্ড কাড়িয়া লইয়া আবার মানুষের বাসোপযোগী করিয়া তোলা হইতেছে। নষ্টভূমি উদ্ধারে এই রাষ্ট্রতন্ত্র পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। দুর্দ্দমনীয়বেগ, ভীষণ-দর্শন (খেয়ালী পাহাড়ী) বর্ষাকালীন নদীকে সংযতবেগ, শান্তদর্শন বার-মাসিক নদীতে পরিণত করিবার ইহাই একমাত্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে প্রকৃতির মনঃপূত হইবে না, ফলে নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দিবে।

মানুষ আজকাল তাহার অমূল্য সম্পদ বনভূমি রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনের জন্য বন কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন বন এমন ভাবে রোপন করে, যাহাতে বনভূমি কোন দিন নিঃশেষ হয় না ফলে কাঠের অভাবও হয় না এবং ক্ষেতেরও সর্ব্বনাশ হয় না।

বনভূমি দুইটি কারণে জমির প্রাণ রক্ষার সাহায্য করে। প্রথমতঃ উপরে বৃক্ষের ডাল ও পালা এবং নীচে তৃণ ও গুল্মের আবরণের উপরে বৃষ্টিধারার প্রথম ধাক্কা পড়ে বলিয়া নরম মাটি ভাঙ্গিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মলাদি পচিয়া হিউমাসে পরিণত হয় এবং মাটির ফাঁপ বাড়াইয়া তুলে। মাটির এই বর্দ্ধিত ফাঁপের জন্য উহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা বাড়ে।

মাটির উদ্ভিদ-আবরণ ও হিউমাস উভয়ে মিলিয়া জমির ভাঙ্গন রোধ

করে এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বহুল পরিমাণে জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। মাটির ক্ষয় নিবারণে বনভূমির শক্তি অসাধারণ, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণতীরে, আফ্রিকার উত্তর উপকূল ভাগে, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিস্তৃত বনভূমি ছিল। রোমান আধিপত্যের যুগে এই স্থানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত। ক্রমশঃ নানা জনপদ হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে ছোট বড় নগরীর প্রতিষ্ঠা হইল। নগরীগুলির চাহিদা মিটাইতে গিয়া লোভে মানুষের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইল, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিবার সে অবসর পাইল না; ফলে ক্রমশঃ বনভূমি নিঃশেষে উজাড় হইল। ভূমির প্রধান রক্ষক অপসারিত হওয়ায় তৃণভূমি কতদিন আর যুঝিতে পারে। মেষ, ছাগ ও পঙ্গপাল তৃণভূমির তৃণ চাঁচিয়া খাইয়া ফেলিল। ভূমির আবরণ বিনষ্ট হওয়ায় মিত্র জল, বায়ু ও তাপ শত্রুরূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ উপরের সার মাটি ধুইয়া মুছিয়া স্থানান্তরে নীত হইল। তাহার পর অনুকূল যোগাযোগ উপস্থিত হওয়ায় দক্ষিণের মরুভূমি হইতে ঝড়ের মুখে বিশাল বালিয়াড়িগুলি উড়িয়া আসিয়া ঐ ভূমিতে চাপিয়া বসিল। ফলে মানুষের নির্বুদ্ধিতার জন্য কোমল শস্যশ্যামল ভূমি আজ নিষ্করুণ রুক্ষ মরুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

মানুষের হিংসার ও বুদ্ধির দোষে ইরাণেরও আজ অনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বনভূমি অন্তর্হিত হওয়ায় উহার আবহাওয়ার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; ফলে তদ্দেশবাসী মানুষের, এমন কি জীব জন্তুরও, আচার, ব্যবহার, জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি আদির দেশোপযোগী এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে পূর্ব্বের মানুষ আসিলে তাহাদের বংশধরদিগের আর চিনিতে পারিবে না। জমির অপব্যবহার করিবার ফলে ইহুদিদিগের দেশেরও ঐ একই দশা হইয়াছে।

৫

প্রাণের লীলায় বায়ুর স্থান

মাটির উর্ব্বরতা রূপান্তরিত হইয়া ফসলে পরিণত হয়। এই পরিণতির জন্য অক্সিজেন সংযোগ প্রয়োজন; সেই জন্য মাটির ব্যাক্‌টিরিয়া, ফুঙ্গি আদি অণুকীটসংঘ ও সক্রিয় মূলগুলির জন্য বায়ুর অবিরাম যোগান একান্ত আবশ্যক। প্রাণবন্ত মাটি না হইলে প্রাণবন্ত ফসল জন্মিতে পারে না। মাটিকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে উহার মধ্যে অবাধ বায়ু চলাচলের
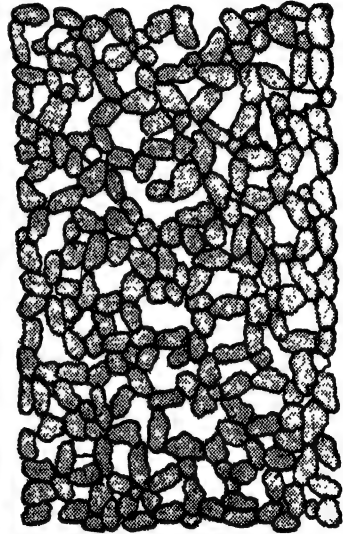
জীবাণু: এইগুলি মাটিকে সারাল করে।

মাটিকণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ুর প্রবেশ পথ।

ব্যবস্থা থাকা দরকার। চাষীরা বৈজ্ঞানিক কারণ না জানিলেও উহাদিগের চিরাচরিত চাষ প্রথায় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে শীতের শেষে কলাবাগানে লাঙ্গল দেওয়া হয় বা মাটি কোপাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বায়ু মাটির মধ্যে অবাধ প্রবেশ পথ পায়।

বর্ষাকালে ইহার প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির জলে প্রচুর অক্সিজেন গুলিয়া থাকে, ফলে বৃষ্টির জলের সহিত চুইয়া চুইয়া উহা মাটির মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায়। মাটীর অসংখ্য ছিদ্রপথে জলের সহিত মাটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি প্রবেশপথ পাওয়ায়, ভিতরের আল্‌গা মাটি জমাট বাঁধিয়া উঠে। এইরূপে বর্ষান্তে মাটির ফাঁপ নষ্ট হইয়া গেলে লাঙ্গল দিয়া মাটি পুনরায় আল্‌গা করিয়া বায়ু চলাচলের পথ করিয়া দিতে হয়।

মাটিতে সারমাটি বা হিউমাসের প্রাচুর্য্য না থাকিলে উহার ফাঁপ আরও নষ্ট হয়। হিউমাস মাটির ফাঁপ রক্ষা করে এবং ইহার জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা অত্যধিক বলিয়া জলাভাব সত্ত্বেও ইহার জন্য মাটি বহুদিন সরস থাকে।

পশ্চিমে যে সকল স্থানে বৃষ্টির অল্পতা হেতু খালের জলে চাষ করিতে হয়, ঐ সকল স্থানের মাটি পাথরের মত শক্ত এবং হাজার চাষ করিলেও কয়েকটি সেচের পরেই ফাঁপ হারাইয়া ফেলিয়া শক্ত চাব্‌ড়া বাঁধিয়া উঠে। ফলে মাটিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং উহাতে কোন ফসলই ভাল জন্মিতে পারে না। এই ব্যাধির একমাত্র উপায় মাটিতে অধিকতর পরিমাণে সারমাটি যোগ করা। আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতে গোবর সার ব্যবহৃত হওয়ায় চষা মাটির ফাঁপ বেশী নষ্ট হইতে পারে না।

লোকের ধারণা ফলের গাছের বাগানে, গাছ বড় হইয়া গেলে, আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দেখা গিয়াছে যে সকল গাছ ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, উহাদের গোড়ার চারিদিকে ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে উহারা আবার ফল দিতে আরম্ভ করে। সার দিলে ত কথাই নাই, আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমরা একটি ছোট বাগান কিনি। ঐ বাগানের একটি কাঁঠাল গাছ ও একটি আম গাছ কয়েক বৎসর হইতে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। ঐ গাছ দুইটি কাটিয়া ফেলিব স্থির করিলাম। ঐ গাছ দুইটির তলে

গরু বাছুর বাঁধা থাকিত, ঐ স্থানেই উহারা মল মূত্র ত্যাগ করিত। তাহার উপরে ঐ বাগান এক বৎসরে তিনবার কোপাইয়া দেওয়ায় পর বৎসর আশাতীত ফল পাওয়া গেল। গাছের তলায় ঘাসের চাব্ড়া মাটির মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়াছিল। গাছের সকল শক্তি নিশ্বাস লইতে ব্যস্ত থাকায় ফল দেওয়ার আর শক্তি ছিল না। কোপানর ফলে নিশ্বাসের জন্য বায়ুর অভাব না ঘটায় গাছ আবার ফল দিতে আরম্ভ করিল।
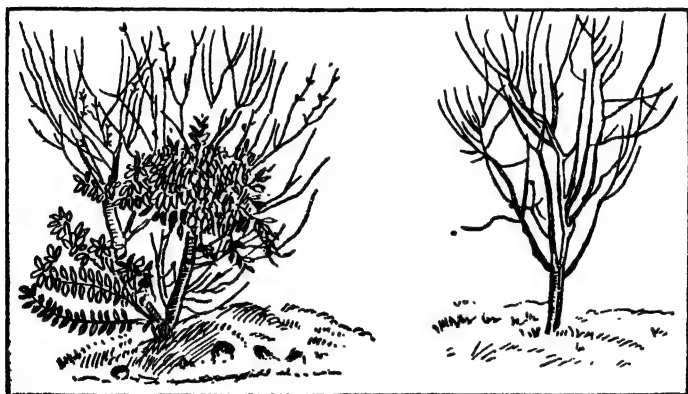
দক্ষিণপার্শ্বের গাছটি বায়ুর অভাবে মৃতপ্রায়, (বামপার্শ্ব) ঐ গাছটির গোড়ায় ইঁদুরে বাসা করায় বায়ু প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে, ফলে শুষ্ক তরুতে পুনরায় জীবনের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এমনও দেখা গিয়াছে ঐরূপ কোন কারণে গাছ বায়ুর অভাবে দমবন্ধ হইয়া দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, এমন সময় ইঁদুরে ঐ গাছের তলায় বাসা করার জন্য কয়েকটি সুড়ঙ্গ কাটিল। দেখিতে দেখিতে গাছটিতে নূতন পাতা দেখা দিল। ইঁদুরে গর্ত্ত করায় বায়ুর অভাব ঘুচিল, গাছ নিঃশ্বাস লইতে পাওয়ায় সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। মেঠো ইঁদুরে আমাদের

দেশে ফসল চুরী করিলেও মাটীর মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া জল ও বায়ুর চলাচলের পথ করিয়া দেওয়ায় পরোক্ষে উপকার করে।

যে সকল গাছের ঘাসের জন্য কোন ক্ষতি হয় না, সে গুলির গোড়া খুঁড়িয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহাদিগের মূলের একটা অংশ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে এবং আর একটি অংশ উপর দিকে মাটির উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই উপরে ভাসা মূলের জন্য ঘাস গাছের গলা টিপিয়া মারিতে পারে না। গাছের গোড়া কোপাইয়া ঘাস সরাইযা দিবামাত্র গাছের নিশ্বাসের কষ্ট দূর হইলে গাছের পাতার বর্ণ ও আকারে একটা বেশ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। পাতা রংএ আরও ঘন এবং আকারে আরও বড় হয়। ইহা গাছের পুষ্টির লক্ষণ।

ঘাস ফল ও ফুলের গাছের গলা টিপিয়া মারিতে পারিলেও বনের গাছের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। বনভূমির গাছগুলিতে বসন্তকালে ফুল ধরে ও নূতন পাতা দেখা দেয়। বর্ষারম্ভে পাতার রং ও আকার দর্শনে একটা বিশেষ নয়নানন্দকর পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ মাটির ২।৩ ইঞ্চির মধ্যেই অসংখ্য নূতন নূতন মূল ছাড়ে এবং এই গুলির সাহায্যে ঘাসের প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যর্থ করে। উপরের ভাসা বড় মূলগুলিও বেশ পুষ্টি লাভ করে এবং এইগুলি হইতে অসংখ্য কচি মূল বাহির হইয়া সোজা নিম্নে জল পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। গরম কালে যখন উপরের মাটির রস শুকাইয়া ফাট ধরে, সেই সময়েই কচি মূলগুলি জলের খোঁজে নীচে নামে। ইহারা মাটির মধ্যে কেঁচো উই পোকা আদির করা পথে কিংবা মাটির সংকোচনের ফলে ফাটলের পথে নামিয়া কর্দ্দম, বেলে মাটির স্তরে জল খুঁজিতে অগ্রসর হয়। ঋতু অনুযায়ী মাটির অভ্যন্তরে যেমন জলের স্তর নীচে নামিতে আরম্ভ করে, কচি মূলগুলিও ঠিক সেই ভাবে জলের অনুসরণ করে। বন্যভূমির গাছগুলির দুই প্রকার মূল থাকায় ঘাসের অনিষ্টকারী চেষ্টা উহারা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়।

ঘাসের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। বড় গাছের যুঝিবার মত নিজের উপাদান যথেষ্ট থাকায় ইহা বিশেষ কিছু করিতে পারে না, কিন্তু চারা গাছকে একেবারে গলা টিপিয়া দম বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। অক্সিজেন না পাইলে মাটির তলায় অনাবশ্যক উদ্ভিজ্জকে পচাইয়া সারে পরিণত করা, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন লইয়া উদ্ভিদের খাদ্যের জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান প্রস্তুত করা বা উদ্ভিদের পুষ্টির সহায়স্বরূপ জীবাণুসংঘের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আবার অক্সিজেনের সহিত অন্য পদার্থের সংযোগ ঘটিবার সময় কার্বন-দ্বি-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, ইহা কোনরূপ প্রাণলীলার পক্ষেই অনুকূল নহে। নূতন বায়ু যোগানর পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, নূতন বায়ু প্রবাহ আসিতেও পায় না এবং বিষতুল্য এই কার্বন-দ্বি-অক্সাইড বাহির হইয়া যাইতেও পায় না। ফলে গাছের বিশেষ অনিষ্ট হয়। ঘাসের বায়ু চলাচলের পথ রোধ করাই ইহার মূল কারণ।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সহিত যেমন অক্সিজেন গুলিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি প্রায় পাঁচগুণ পরিমাণ কার্বন-দ্বি-অক্সাইডও জলে গুলিয়া মাটির ভিতরে গাছের গোড়ায় গিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে মাটির মধ্যে জলের স্তর উপরে উঠিয়া আসে, ইহাতে মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে মাটির ফাঁপ নষ্ট হওয়াতেও বায়ু চলাচলের অসুবিধা হয়। এই সময় গাছের মূলগুলি পুষ্টির জন্য জল, বায়ু ও খাদ্য অন্বেষণে উপর দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ষারম্ভে ও বর্ষান্তে যখন মাটি বেশ সরস থাকে এবং মাটির ফাঁপ বজায় থাকে তখন ক্ষেতে যথেষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত উপাদান উৎপন্ন হয় বলিয়া উদ্ভিদের বাড়ের উপযুক্ত সময়।

দোঁয়াশ মাটির সারভাগ ও কেঁচোর সংখ্যা কমিয়া আসিলে মাটির তলায় একটা আঠাল শক্ত মাটির স্তর গড়িয়া উঠে। লাঙ্গল যতখানি খুঁড়িতে পারে ততখানি মাটির ফাঁপ থাকে; কিন্তু উহার তলায়

যে স্তরটি ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে, উহা আঠাল শক্ত মাটিতে গঠিত হওয়ায় সিমেণ্টের মেঝের মত হইয়া দাঁড়ায়। ফলে বৃষ্টির বা সেচের জল পড়িলে, উহা মাটির গভীর প্রদেশে যাইতে না পাইয়া, ঐ নিরেট শক্ত মেঝের উপর গিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এই জলের আবরণের জন্য এইরূপ জমির নীচেকার অংশে বায়ু চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় এবং সেখানে উদ্ভিদের অনুকূল কোনপ্রকার জীবলীলা সম্ভব নয়। উপরের স্তরেও কোন উদ্ভিদ জন্মিলে উহার মূল এই জলের স্তরে নামিয়া আসিলে পচিয়া উঠে বলিয়া গাছ শুখাইয়া মরিযা যায়। ইহাও বায়ুর অভাবে দম বন্ধ হইয়া মরা। এইরূপ জমিকে জলবসা জমি বলে।

বেলে জমিতে এইরূপ অবস্থা খুব শীঘ্রই ঘটে। জলের সহিত বালির সূক্ষ্ম কণা গিয়া নীচের স্তরের ছিদ্রগুলি ভরাট করিয়া দেওয়ায় জল বসিতে আরম্ভ করে। রাসায়নিক সার উদ্ভিদ-খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে উহার তেজে কেঁচো আদি জমির তাপ উৎপন্নকারী জীবকুলের মৃত্যু ঘটে, ইহাতেও ক্ষেতের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

এইরূপ জমির উর্ব্বরতা বা প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে হইলে প্রথমতঃ মাটির নীচের ঐ শক্ত আঠাল স্তর কোপাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং উহাতে উপযুক্ত পরিমাণে সারমাটি বা হিউমাস দিতে হইবে।

আমাদের দেশে ধানের জমিতে আমন ধানের পরে খেসারি কড়াই জন্মাইবার যে প্রথা আছে, উহা এরূপ ব্যাধির মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জমিতে কোন আঁবমূল (Leguminous) উদ্ভিদের চাষে জমির এই ব্যাধি অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পঞ্জাবে লুসার্ণ (Lucern) তৃণজাতায় এক উদ্ভিদ চাষে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। দাক্ষিণাত্যে প্রচণ্ড গরমে মাটি শুকাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া শত সহস্র স্থানে গভীরভাবে ফাটিয়া যাওয়ায় এই ব্যাধির চিকিৎসা প্রকৃতি আপনি করেন।

৬

মাটির আত্মরক্ষা করিবার বিধি (১)

যে উদ্ভিদের একাধিক ফল বা বীজ একটি শুটির মধ্যে থাকে উহাকে কড়াই গোষ্ঠীভুক্ত বলা চলে। ইংরাজিতে এইগুলিকে Leguminous plants বলে। মটর, তেওড়া বা খেসারি, অড়র, মুগ আদি এই কড়াই গোষ্ঠীভূক্ত উদ্ভিদ। উদ্ভিদজগতে ধান, গম, আক আদি তৃণগোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদের পরেই কড়াই-গোষ্ঠীর স্থান। একদিক দিযা কড়াইজাতিকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে।

তৃণজাতীয় উদ্ভিদ মাটির সার নিঃশেষে গ্রহণ করিযা মাটিকে ক্ষীণ-সার করিয়া তোলে, কিন্তু কড়াইজাতীয় উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনকে অন্যান্য উপাদানে বদ্ধ করিয়া মাটিকে সারবান করিয়া দেয়। খাদ্য হিসাবেও ইহা অধিক তেজস্কর, ইহাতে প্রোটীনজাতীয় উপাদান প্রচুর থাকে। তৃণজাতীয় উদ্ভিদে কার্ব-হাইড্রেট ও শর্করা প্রচুর থাকে বলিয়া দেহযন্ত্র চালাইবার উপযুক্ত ইন্ধন ইহা হইতে পাওয়া যায়, শরীরের মাংসাদি গড়িয়া তুলিতে প্রোটীন অপরিহার্য্য।

কড়াই-গোষ্ঠী জীব ও মাটির যুগপৎ আহার যোগায় কি করিয়া তাহারই আভাস এই স্থানে একটু দিব।

বহুদিন হইতেই চাষী জানিত যে ক্ষেতে কড়াইয়ের চাষ করিলে ক্ষেত সারবান হয়। কি করিয়া সহজে ক্ষেতকে সারাল করা যায় তাহা চাষীদের জানা থাকিলেও, কেন হয় তাহা তাহাদের জানা ছিল না। বৈজ্ঞানিক এতদিনে এই 'কেন'র উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

উদ্ভিদের নীরোগ থাকিবার জন্য ও তাহার সময়োচিত বাড়ের জন্য প্রয়োজন প্রচুর প্রোটীনখাদ্য। নাইট্রোজেন অন্যান্য উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া এই প্রোটীন গড়িয়া তুলে। নাইট্রোজেন বিনা জীবাধার

গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং জীবাধার বিনা প্রাণের কোনরূপ লীলাই চলা সম্ভব নহে। উদ্ভিদ বা প্রাণী যে কোন জীবই নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্যাভাবে রুগ্ন হয় এবং ক্রমশঃ কৃশ হইয়া মারা পড়ে।

মুক্তাবস্থায় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে এত আছে যে তাহা হিসাব করিয়া শেষ করা যায় না। বায়ুমণ্ডলের পাঁচভাগের চার ভাগই নাইট্রোজেন, এক বর্গহাত ক্ষেত্রের উপর যে বায়ুস্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে, উহাতে প্রায় ৪০।৫০ মণ নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু এত নাইট্রোজেন থাকিলে কি হয়, মুক্তাবস্থায় ইহা উদ্ভিদের কোন কাজেই আসে না; অন্য উপাদানের সহিত যুক্তাবস্থায় ব্যতীত উদ্ভিদ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না।

উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে হইলে কোন কোন উপাদানের সহিত যুক্তাবস্থায় গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষেরা আমিষ ও নিরামিষ আহারে নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান গ্রহণ করিয়া নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে; আমিষাশী ও নিরামিষাশী প্রাণীদের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা। উদ্ভিদ মাটি হইতে নাইট্রোজেনযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া পরিণতি লাভ করে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় মাটিতে নাইট্রোজেনযুক্ত উপাদানের অভাব হইলে সকলকারই বিপদ।

ক্রমাগত উদ্ভিদ জন্মিবার ফলে মাটির নাইট্রোজেনযুক্ত উপাদানের অভাব ঘটিবেই, তখন কি হইবে? প্রকৃতি কি কোন ব্যবস্থাই করেন নাই? কোন ব্যবস্থা না করিলে মাটি অনুর্ব্বর উষর ভূমিতে পরিণত হইবে, কালে ঐস্থান জীবগণের বাসের অযোগ্য মরুভূমিতে পরিণত হইবে। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণদিকে যে বিশাল মরুভূমি আজকাল দেখা যায় এককালে উহা উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা অগণিত জীবকুলের বাসভূমি ছিল। উল্লিখিত কারণে ক্রমশঃ উহা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। এক কথায় প্রাণবন্ত মৃত্তিকা নাইট্রোজেনযুক্ত আহারের অভাবে প্রাণ হারাইয়াছে।

আমাদের দেশের চাষীরা কিন্তু ইহার উপায় বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করে। পচা গোবর মাঠে দিলে মাটির এই খাদ্যাভাব খানিকটা ঘোচে, একথা তাহাদের জানা ছিল। আর একটা জিনিস তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল। কোন কোন জাতীয় ফসলে যেমন মাটি ক্ষীণসার হইয়া পড়ে, আবার কোন কোন ফসলে মাটি সারাল হয়। কেন হয় তাহা না জানিলেও তাহারা জানিত কি করিয়া মাটির সারের অভাব ঘুচিতে পারে।

পশুপক্ষীর মলমূত্রে বা পচা লতাপাতায় নাইট্রোজেনযুক্ত উপাদান থাকায় মাটির খাদ্যের অভাব হয় না। পূর্ব্বে মানুষের সংখ্যা ছিল অল্প সেই অনুপাতে গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ছিল অধিক; তখন ঐপ্রকার প্রাণীজ সারের অভাব ঘটিত না। ক্রমশঃ মানুষের সংখ্যা অসম্ভব বাড়ায় এবং মানুষের নির্বুদ্ধিতায় বহু উর্ব্বরা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হওয়ায়, গোচর ভূমিগুলি চাষের ভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল। তখন মানুষ ও গরুতে খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। স্বভাবতঃ পশু দুর্ব্বল; মানুষ যখন দেখিল যে গো-মহিষাদি ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহাকেও সে কাটিয়া খাইয়া ফেলিল। মানুষ গোচর চষিয়া আবাদ করিয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু জমি বাঁচিল কি? ক্রমশঃ বহু জমি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে শুখাইয়া মরিয়া গেল।

ইয়োরোপ আদি যন্ত্রবলে বলীয়ান দেশের এই দুর্দ্দশা হইলেও আমাদের দেশের ঠিক সেইরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। তাঁহার কারণ হিন্দুর জাতিগত "কুসংস্কার"! গরুকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়া সে আর উহাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলিতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশের চাষীরা বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করে যে কড়াইজাতীয় ফসলে জমি নষ্ট উর্ব্বরতা ফিরিয়া পায়। আমাদের দেশে তাই সারক্ষয়কর ধান গম আদি তৃণজাতীয় ফসলের শেষে জমিতে

তেওড়া ও কালী কড়াইয়ের চাষের প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে ধানের ক্ষেতে যখন জল শুখাইয়া আসে, ধানে পাক ধরে, তখন তেওড়া বা খেসারী কড়াই ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ধান কাটিয়া শুখাইয়া ক্ষেত হইতে তুলিয়া লইলে তেওড়া কড়াই বাড়িতে থাকে এবং কালে ফসল দেয়। এই লতার আগাগোড়া নাইট্রোজেনঘটিত উপাদানে গঠিত। শুঁটিগুলির মধ্যে থাকে প্রোটিন-বহুল খেসারি ডাইল, লতায় পাতায় এত নাইট্রোজেনঘটিত উপাদান থাকে যে গো-মহিষাদি উহা এমন সাগ্রহে গ্রহণ করে যে তখন নাইট্রোজেন-বহুল খোল দিবার প্রয়োজন হয় না।

আউস ধানের শেষে ঐরূপ কালী কড়াই ছড়াইয়া বিনাশ্রমে অনুরূপ ফলই পাওয়া যায়। পশ্চিমে গমের সঙ্গে ছোলা মটর আদি কড়াই চাষের প্রথা আছে। ইহাতেও জমি নষ্ট সার কতক উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু নাইট্রোজেনযুক্ত সার না পাইয়াও জমি কোথা হইতে নাইট্রোজেনযুক্ত উপাদান যোগায় ?

বৈজ্ঞানিক যখন চাষীর এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করিলেন তখন ইহার কারণ কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। বহু গবেষণার পর আজ ইহার কারণ ধরিতে পারা গিয়াছে। প্রকৃতি অলক্ষ্যে যে রহস্যের জাল এতদিন বুনিয়া আসিতেছিলেন তাহা আজ বৈজ্ঞানিকের নিকট অতি সরল ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।

মাটির ফাঁপ না থাকিলে ফসল হয় না। এইজন্য জমিতে ঘন ঘন লাঙ্গল দেওয়া হয়। জমির ফাঁপ থাকিলে ঐ পথে বায়ু চলাচল সম্ভব হয়। উদ্ভিদের বাড়ের জন্য নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়েরই প্রয়োজন। এই উপায়ে গাছের গোড়া পায় প্রচুর পরিমাণে এই উপাদান দুইটি।

কড়াইজাতীয় উদ্ভিদের মূল অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাদের মূলের গায়েগায়ে অসংখ্য আব জন্মায়। এই আবগুলির

মধ্যে অসংখ্য ব্যাকৃটিরিয়া বাসা বাঁধে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা মাটি প্রাণহীন জড় উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহা আমাদের ত্রুটিপূর্ণ চোখের ভুল দেখা মাত্র। অনুবীক্ষণে দেখিলে উহাতে এক নূতন অত্যাশ্চর্য্য অনুকীটপূর্ণ জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্দ্ধছটাক পরিমিত সারাল মাটিতে এরূপ ১৫ কোটি অনুকীট (Bacteria) বাস করে। সারের অনুপাতানুযায়ী এই সংখ্যা ৩০০ কোটি পর্য্যন্ত হয়।
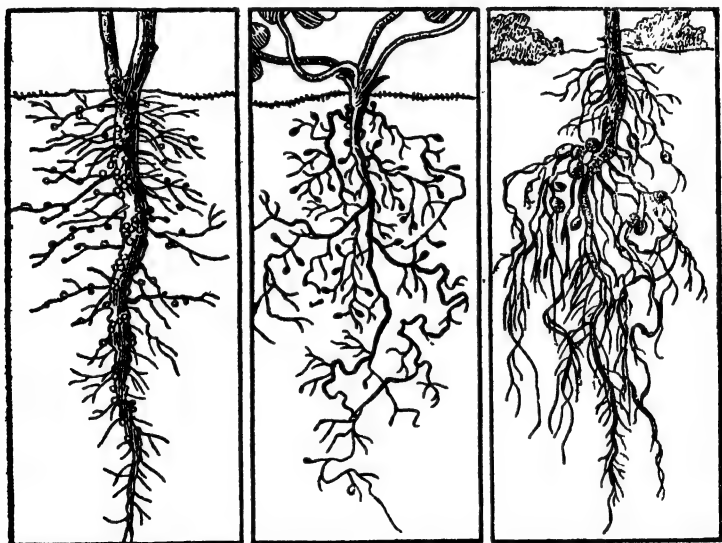
কড়াই গোষ্ঠীভুক্ত তিন জাতীয় উদ্ভিদের মূল। ১মটি হর্সবীন (horse bean) ২য়টি রেড্ ক্লোভার (red clover) এবং ৩য়টি সয়াবীনের (soya bean) মূল।

কোন সুযোগে মাটির এই অসংখ্য অনুকীটগুলির মধ্যে একাধিক জাতি কৈশিকমূলের মুখ দিয়া গিয়া ভিতরে বাসা বাঁধে এবং অতি দ্রুত

বংশ বিস্তার করিতে থাকে বলিয়া স্থানে স্থানে মূল ফুলিয়া আবের মত দেখায়। এইরূপে একটি মাত্র চারা গাছের মূলেই অসংখ্য কোটি অনুকীট জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসা বাঁধে। উদ্ভিদ আপন পুষ্টির জন্য যে শর্করাটুকু প্রস্তুত করিয়াছিল উহারা উহাই আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে এবং কৈশিক মূলের ফাঁকে ফাঁকে যে বায়ু চলাচল করে উহা হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া অন্যান্য উপাদানের সহিত জট পাকাইয়া আপন দেহ গঠিত করিতে থাকে।

অনুকীটগুলি উদ্ভিদের সঞ্চিত শর্করাটুকু আত্মসাৎ করায় উহার খাদ্যাভাব ঘটে। এই খাদ্যের অভাব অনুকীটগুলির প্রস্তুত নাইট্রোজেন-ঘটিত উপাদান গ্রহণ করিয়া উহা পূরণ করে। এইরূপ আদানপ্রদানের ফলে কাহারও খাদ্যভাব ঘটে না এবং মুক্ত নাইট্রোজেন অন্য উপাদানের সহিত বদ্ধ হইতে থাকায় মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত উপাদানের অভাব হয় না। এইরূপ উদ্ভিদ আয়ুশেষে তুলিয়া ফেলিলেও উহাদের কতকাংশ মূলরূপে মাটির মধ্যে থাকিয়াই যায়। এই মূলগুলির আবগুলিতে অসংখ্য অনুকীট বাসা বাঁধে ও বংশবিস্তার করে; উহাদের দেহ হইতে প্রচুর নাইট্রোজেনঘটিত উপাদান মাটি পায়। ফলে সার দিলে যে লাভ হয়, এইরূপ চাষে সেইরূপ ফললাভই হইয়া থাকে।

এই জাতীয় উদ্ভিদের বীজের আয়ু খুব বেশী। এমনও দেখা গিয়াছে এই জাতীয় বীজ হইতে দুইশত বৎসর পরেও উপযুক্ত যোগাযোগে প্রাণবন্ত উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। বীজের উপরের খোসা খুব পুরু হওয়ায় বীজের প্রাণশক্তি সহজে নষ্ট হয় না। অনুকীটকে উদ্ভিদ আহার যোগায়, ফলে কৃতজ্ঞ অনুকীট উদ্ভিদকে আহার যোগায়; অধিকন্তু মাটিকেও সারাল করে। এইরূপ ক্ষেত্রে মাটি, অনুকীট ও উদ্ভিদের মধ্যে বেশ একটা প্রাণপূর্ণ সহযোগিতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেনের বন্ধন ও মুক্তি

আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণে মুক্ত নাইট্রোজেন জলীয় বাষ্পের সহযোগে অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া নাইট্রিক য়্যাসিড গড়িয়া তুলে। এই সদ্য-জাত নাইট্রিক য়্যাসিড বৃষ্টির জলে ধুইয়া মাটিতে নামিয়া আসে। এইরূপে দিনে নাকি আড়াই লক্ষ টন (২৭৷৷০ মণে এক টন হয়) য়্যাসিড ধরা বক্ষে বৃষ্টির জলের সহিত নামে। ইহার অধিকাংশই অসার ভূমি ও সমুদ্রের জলে গিয়া পড়ে, মাটির ভাগ্যে অল্পই জোটে। সারাল মাটিতে যেটুকু পড়ে উহা হইতে নাইট্রেট প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ বায়ু ও মাটি হইতে অজৈব (inorganic) উপাদান লইয়া নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব (organic) উপাদান গঠিত করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। উদ্ভিদের এই কার্য্যে ব্যাক্টি-অয়েডস্ নামক অণুকীটগুলি প্রধান সহায়। কয়েক প্রকার শ্যাওলা (algæ) ও ছাতা (fungus) জাতীয় উদ্ভিদ মুক্ত নাইট্রোজেনকে খাদ্যে পরিণত করিতে পারে।

উদ্ভিদ অজৈব উপাদানগুলিকে জৈব উপাদানে পরিণত করিলে নিরামিষাশী জীব উহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। আবার আমিষাশী জীব নিরামিষাশীর দেহ-যন্ত্রে রূপান্তরিত প্রোটিন নামে নাই-ট্রোজেন ঘটিত জৈব উপাদান গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ্-আধারগুলি পচিবার সময় য়্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। মাটিতে অণুকীটগুলি ইহাকে অক্সিজেনের সাহায্যে নাইট্রাইটে (nitrite) পরিণত করে। পরে এই নাইট্রাইট নাইট্রেটে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টিতে সাহায্য করে। এইরূপ রূপান্তরের সময়ে বদ্ধ নাইট্রোজেনের কতকাংশ মুক্তি পায়। ইহাও এক প্রকার অণুকীটের কার্য্য। এই অণুকীটগুলি বায়ুমণ্ডলের কার্বন-দ্বি-অক্সাইড হইতে কার্বন গ্রহণ করে।

এইরূপে সৃষ্টিশৃঙ্খলায় বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনের অণুকীটসংঘের সাহায্যে অজৈব ও জৈব উপাদানে বদ্ধ হওয়া এবং পুনরায় মুক্তি পাওয়ায়, উহার একটা চক্রাকার গতি উৎপন্ন হয়। মুক্তকে বদ্ধ না করিলে যে তাঁহার লীলা চলে না, তাই কি এই ব্যবস্থা ?

৭

মাটির প্রাণ বা উর্ব্বরতা

মাটির উর্ব্বরতা কি ? এই উর্ব্বরতা ক্ষেতের ফসল ও প্রাণীর উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে ?

ক্ষুদ্র রসশালায় বন্দী আপন সংস্কারাবদ্ধ বৈজ্ঞানিকের খণ্ডদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহার সদুত্তর পাওয়া দায়। রাসায়নিক আসিয়া এক কথা বলিবেন, জীবাণুতত্ত্ববিদ আসিয়া আর এক কথা বলিয়া মাথা নাড়িবেন, প্রাণিতত্ত্ববিদের মতামত আর এক পথে লইয়া গিয়া মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানের নানা পণ্ডিত আসিয়া নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসে এমন বাক্যজাল রচনা করিবেন যে তাহা হইতে অর্থ পরিষ্কার হওয়াত দূরের কথা, সাধারণ লোকের মাথা ঠিক থাকে কি না সন্দেহ।

দ্রষ্টার অখণ্ডদৃষ্টি দিয়া প্রকৃতির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে ইহার অতি সহজ ও বোধগম্য উত্তর পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই বিশাল প্রাণচক্রের প্রতি অংশটুকু অপরের সহিত অতি নিবিড়ভাবে জড়িত, প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে, সেখানে একটিকে বাদ দিয়া আর একটিকে

দাঁড় করাইবার চেষ্টা নাই। সৃষ্টিতে দেখা যায় জন্ম ও মৃত্যু একটি অপরটির সম্পূরক মাত্র। একটিকে বাদ দিলে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না।

প্রাণচক্রের একটা মোটামুটি বিচার করা যাউক। মাটিতে শস্য জন্মিল, এই শস্য প্রাণীর আহার্য্য। আবার এই শস্য ও প্রাণীর কতকাংশ মানুষের খাদ্য। ক্ষেত হইতে শস্য, শস্য হইতে প্রাণী, প্রাণী হইতে মানুষ—এই ক্ষেত হইতে মানুষ পর্য্যন্ত প্রাণচক্রের প্রতি অংশটি প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। এই চক্রের পাবে পাবে প্রাণের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে ; এ যেন এক আধার হইতে আর এক আধারে প্রাণের লীলাখেলা চলিয়াছে। এ ব্যবস্থায় মরণ ও জীবন একই লীলার দুইপিঠ মাত্র ; দেখার পার্থক্যে বিভিন্ন দেখায়, মূলে কিন্তু সেই এক প্রাণস্রোতের অবিরাম গতি ছাড়া আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

সৃষ্টির জাল বুনিবার জন্য মরণ সূতার যেমন প্রয়োজন, আবার মৃত্যু-লীলার জন্য সৃষ্টিরও তেমনি প্রয়োজন। একটির লীলা অপরটির উপর নির্ভর করে। জনম ও মরণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে উহা অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া বোধ হয়, এক সঙ্গে দেখিলে উহা আর দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকে না, প্রাণের অতি সহজ লীলা হইয়া দাঁড়ায়।

সৃষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থার মূলে সূর্য্যকিরণ বা তেজ। উদ্ভিদের সবুজ পাতার ক্লোরোফীল (cholorophyll) যোগে উদ্ভিদজগৎ মহাকাশে বিকীর্ণ মুক্ত সৌরতেজকে বদ্ধ করিয়া সৃষ্টি কার্য্যে লাগায়। ফলে উদ্ভিদই আকাশ, বাতাস ও মাটির অজৈব উপাদানগুলিকে মিলিত করিয়া কার্ব-হাইড্রেট ও প্রোটীনরূপী প্রাণীর খাদ্যে পরিণত করে। এই সামান্য পাতার কার্য্যকারিতার উপর আমাদের পৃথিবীর জীবকুলের ও আমাদের অস্তিত্ব ও মঙ্গল নির্ভর করে। এই সামান্য সবুজ পাতা ব্যতীত সৌর-তেজকে আমাদের এই পৃথিবীর প্রাণচক্রে বাঁধিবার আর কোন দ্বিতীয়

উপায় নাই। এই সামান্য পাতার সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পুষ্টির জন্য আর কোন পথ নাই।

সামান্য এই পাতার ঐ অসামান্য কাজের জন্য চাই উহার জন্মভূমির এমন অনুকূল যোগাযোগ যাহাতে উহার মূলগুলি ক্ষেত হইতে সহজেই আপন পুষ্টির জন্য প্রয়োজন মত আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে। ক্ষেত ও উদ্ভিদের মধ্যে উদ্ভিদের মূলই হইল সেতু। আবার মূল, জীবাণুসংঘ (micorrhizal association) ও অসংখ্য কৈশিক মূল সাহায্যে আপনার কর্ত্তব্য পালন করে। এই দুইটি অতি ক্ষীণ ও অসহায় সহায়ের সাহায্যে সুচারুরূপে কার্য্য প্রতিপালনের জন্য চাই মাটির সর্ব্বোত্তম সচ্ছিদ্র অবস্থা।

মাটির ফাঁকে ফাঁকে রসের মধ্যে সংখ্যাতীত ব্যাক্‌টিরিয়া, ফুংগি ও প্রোটোজোয়ার মত জীবাণুসংঘ জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত আপন আপন জীবনের ইতিহাস অদৃশ্যলিপি দিয়া লিখিয়া চলে। কৈশিক মূলগুলি আপন ক্ষীণ অঙ্গ দিয়া মাটি হইতে জলেগোলা ধাতবলবণাদি প্রয়োজন মত যোগান দেয়। ইহাদের কাজ মালমসলা অজৈব আকারে যোগাইয়া দেওয়া; সবুজ পাতার কাজ এই মালমসলাগুলি লইয়া সৌর তেজের সাহায্যে জৈবাকারে রূপান্তরিত করা।

সচ্ছিদ্র মাটির ফাঁকে ফাঁকে বায়ু প্রচুর পথ পাওয়ায় অক্‌সিজেন যোগানর অভাব হয় না, ফলে জীবাণুসংঘ ও কৈশিক মূলগুলির কার্য্য সুষ্ঠুরূপেই চলে। ইহাদের কার্য্যের ফলে কার্বন-দ্বি-অক্‌সাইড পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এই গ্যাস জীবের জীবন-ধারণের অনুকূল নহে, সেই কারণে মৃত্তিকাস্থ ফাঁকগুলিতে অবিরাম বায়ুমণ্ডলের সহিত সংস্পর্শ রাখা দরকার। এই জন্যই বায়ু চলাচলের জন্য মাটির প্রয়োজন মত কর্ষণ না হইলে চলে না। কর্ষণের ফলেই মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের প্রয়োজনমত পথ পায়।

কর্ষণে মাটির মধ্যে একটা ফাঁপ ঘটে ; মাটির এই ফাঁপকে যতদিন যতখানি বজায় রাখিতে পারা যায়, ততই চাষের পক্ষে মঙ্গল। জল পড়িলে ক্রমশঃ মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি মিলিয়া একটা আটাল আবরণের সৃষ্টি করিয়া মাটির ফাঁপ অনেকখানি নষ্ট করে। মাটিতে হিউমাস বা সারমাটি থাকিলে মাটির ফাঁপটি বহুদিন বজায় থাকে, ফলে গাছপালার প্রাণস্বরূপ বায়ুর প্রয়োজনমত চলাচলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

সারমাটির জন্য মৃত্তিকার অসংখ্য বাসিন্দার (জীবাণুসংঘের) আহারের জন্য জৈব উপাদানের অভাব হয় না। উপযুক্ত পরিমাণে সার-মাটির অভাবে মাটির ফাঁপও নষ্ট হয়, সুতরাং অবাধ বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। জৈব উপাদান না পাওয়ায় জীবাণুসংঘ আহারের অভাবে বাড়িতে পায় না ফলে মাটির স্বাভাবিক আত্মনির্ভরশীল ব্যবস্থায় গোলোযোগ ঘটে। এইরূপ নানা কারণে গাছ পালার অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, জল ও মৃত্তিকাস্থ লবণাদির যোগানোর ত্রুটির জন্য গাছ পালার খাদ্যের অভাব ঘটে।

সবুজ পাতা কাঁচামালের অভাবে উপযুক্ত পরিমাণে শ্বেতসার (carbo-hydrate) ও প্রোটিন প্রস্তুত করিতে পারে না। ফলে গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অজৈব উপাদান হইতে জৈব উপাদানে পরিণতিরূপ প্রাণ-লীলার প্রথম পর্ব্বে হিউমাস বা সারমাটির একটা বিশেষ স্থান আছে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

অণুকীটগুলি সারমাটি হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া বাড়ে এবং তন্তুকোষগুলি আবার এই অণুকীটগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া গাছের বাড়িবার রসদ যোগায়। এক সৃষ্টির, পরবর্ত্তী সৃষ্টির আহার্য্যরূপে জন্মিয়া, প্রাণের ক্রমবিকাশে সাহায্য করাই কাজ। একের মরণে আর একের জনম—প্রকৃতি সৃষ্টিক্রিয়ার সাম্য এইরূপেই রক্ষা করেন। এইরূপ ব্যবস্থায় অপচয় বা মল বলিয়া কোন বস্তু নাই—তাই প্রাকৃতিক সৃষ্টি

আত্মনির্ভরশীল। যে ব্যবস্থায় এইরূপ সমতা রক্ষার উপায় নাই, সে ব্যবস্থার অপচয় প্রচুর। যে ব্যবস্থার অপচয় দেখা যায়, সে ব্যবস্থা কোন দিন আত্মনির্ভরশীল বা সফল হইতে পারে না।

অণুকীটগুলি গাছপালা ও মাটির উর্ব্বরতার মাঝে সেতুস্বরূপ। মাটির উর্ব্বরতাই পরে ফসলে পরিণত হয়। সারমাটি এই পরিণতি সহজ সুন্দর ও নির্দ্দোষ করিবার জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রকৃতির ব্যবস্থায় দেখা যায় একদিকে যেমন মরণ ঘটিতেছে; অপরদিকে উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তেমনি সৃষ্টিক্রিয়া চলিতেছে। মরণ ও জনম এই দুই বিপরীতধর্ম্ম ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃতিদেবী তাঁহার সৃষ্টি-চক্রের নানা পর্ব্বে সাম্য রক্ষা করেন। সাম্য রক্ষা করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টি আত্মনির্ভরশীল ও ক্রমবিকাশমান।

মানুষের চাষের ব্যবস্থায় প্রকৃতির অনুকরণে একের মরণকে যেখানে অন্যের সৃষ্টির পরিবর্দ্ধনে যতখানি নিয়োজিত করা সম্ভব হইয়াছে, সেই-খানে চাষ ততখানি সফল। সেক্ষেত্রে একের মল বা আবর্জ্জনা লইয়া ফ্যাসাদে পড়িতে হয় না; মল অন্যের খাদ্যে পরিণত করিয়া সাম্য রক্ষা করা হয়। সেখানে চাষ সুলভ, সুন্দর, নির্দ্দোষ ও ত্রুটিহীন। সে দেশের লোকের ও গো মহিষাদির স্বাস্থ্যের প্রকাশে চাষের সফলতা ফুটিয়া উঠিবে।

উদ্ভিদের গর্ভাধান

সৃষ্টির প্রথম পর্ব্বে এককোষ প্রাণী বা উদ্ভিদের বংশ-বিস্তার অতি সহজেই ঘটিত। জীবের গঠনও ছিল সরল, তাই বংশবিস্তারের কৌশলও ছিল তদনুরূপ সরল। প্রাণাধার বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইলে দ্বিখণ্ডিত হইয়া বংশবিস্তার করিত। সৃষ্টিচক্রে এখনও এইরূপ এককোষ প্রাণাধার বহু দেখা যায়। ক্রমশঃ প্রাণাধারের বিকাশের পর্ব্বে পর্ব্বে নানা ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ ঘটিল। আহার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থার পরেই উদ্ভিদে প্রথমে দেখা দিল স্পর্শেন্দ্রিয়; লজ্জাবতী লতা উহার চাক্ষুষ প্রমাণ। প্রচণ্ড রৌদ্রে যে সবুজ মুসড়াইয়া পড়ে, উহাই আবার বৃষ্টিধারায় স্নান করিয়া প্রফুল্লভাব ধারণ করে।

উদ্ভিদও প্রাণীর মত ক্রমশঃ এককোষ-আধার হইতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি পথে জননেন্দ্রিয় লাভ করিল। স্থাবর প্রাণাধার জননেন্দ্রিয় লাভ করায়, প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিদেবী একই আধারে, স্ত্রী ও পুরুষের, উভয় জননেন্দ্রিয়ই বিকশিত করিলেন। এই দ্বিলিঙ্গ (hermaphrodite) প্রাণাধার এখনও উদ্ভিদ্জগতে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। একই আধারে পুরুষাঙ্গ হইতে রেণু (pollen) স্ত্রী-অঙ্গে পড়িয়া বীজের জন্ম হইলে উহাকে স্বজনন (autogamy) বলা হয়। কিন্তু স্বজনন সাহায্যে বংশবৃদ্ধিতে প্রকৃতিদেবীর উদ্দেশ্য সফল হইল না। দেখা গেল, একই আধারে বিকশিত পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রী-অঙ্গ একই সময়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না, ফলে দ্বিলিঙ্গ আধারে স্বজনন সকল সময় সম্ভবপর হয় না। কালে আর একটি জিনিস ধরা পড়িল ; স্বজননের ফলে তেমন সবল বা স্থায়ী বংশবৃদ্ধি ঘটে না। সেইজন্য প্রকৃতিদেবী এ পথে বংশবৃদ্ধি না করিয়া বরং এইরূপ প্রজননে নানা বাধা সৃষ্টি করিয়া এক

আধারের পুরুষাঙ্গ হইতে রেণু কোন বাহনের সাহায্যে অন্য আধারের স্ত্রী-অঙ্গে আনিয়া ফেলিয়া বংশ বৃদ্ধি আরম্ভ করিলেন। এইরূপ বংশ-বৃদ্ধির উপায়কে পরজনন (Allogamy) বলা হয়।

ক্রমশঃ একই আধারের একটি মাত্র অঙ্গ ক্রমাগত ব্যবহার হইতে থাকায় অন্য অঙ্গটি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। ফলে দ্বিলিঙ্গ আধারের একটি অঙ্গ হইল নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত, অন্যটি হইল সক্রিয়; এইরূপে একলিঙ্গ (diclinous) আধারের জন্ম হইল। একলিঙ্গ-আধার হয় পুরুষাঙ্গ না হয় স্ত্রী-অঙ্গ ধারণ করে। স্বজননজাত বীজ হইতে উদ্ভূত উদ্ভিদের নির্ম্মম জীবনযুদ্ধে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই প্রকৃতি পরজননবিধি প্রচলিত করিলেন। প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই আমাদিগের সমাজে একই গোত্রের কন্যার সহিত পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ। এইরূপ বিবাহের ফলে জাত সন্তান ক্ষীণবল হয় এবং স্বজননজাত উদ্ভিদচারার দশা প্রাপ্ত হয়। গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুদিগের বেলাতেও এই বিধি প্রযুজ্য। প্রকৃতিরাজ্যের এই প্রজননবিধি মানুষ হইতে উদ্ভিদ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আধারেই প্রযুজ্য।

পুষ্পের রচনা কৌশল

ফুলের পাপড়ি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি তবকে একটি খর্ব্ব ডাঁটাকে ঘিরিয়া এই পাপড়িগুলি সাজান। একেবারে বাহিরের তবকটিকে বৃতি (Calyx) বলে; উহার প্রত্যেক অংশের নাম বৃত্যাংশ (Sepal)। তাহার পরের তবকের নাম দলমণ্ডল (Corolla); উহার প্রত্যেক অংশের নাম দল বা পাপড়ি। ইহার পরের মণ্ডলটিকে পুংকেশরমণ্ডল (Andrœcium) বলে; ইহার প্রত্যেক অংশটি পুংকেশর (Stamen) বলিয়া পরিচিত। ফুলের সকলের উপরের তবকটিকে গর্ভকেশর (Pistil) বলে; উহার প্রত্যেক অংশের

নাম গর্ভপত্র (Carpel)। ইহাই হইল পূর্ণাঙ্গ পুষ্পের গঠন বিবরণ।

শাখার পাবের বাড় সাধারণতঃ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় সবুজের পাতাগুলিই তবকে তবকে মণ্ডলাকারে বিকশিত হয়। এইরূপে শাখাই কোন কারণে বাড়িতে না পাইয়া আপনার সকল শক্তি পুষ্পরচনায় নিয়োজিত করে।

জীব দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় নীত হইয়া ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে। একটি উদ্ভিদ বা স্থাবর ধারা ; আর একটি প্রাণী বা জঙ্গম ধারা। জঙ্গম ধারার জীবপুঞ্জের পাদেন্দ্রিয় বিকশিত হওয়ায় বংশ রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই একটি অপরটিকে খুঁজিয়া বাহির করে। কিন্তু উদ্ভিদ্ ধারায় নীত জীবপুঞ্জের পাদেন্দ্রিয়ের অভাবে এ সুবিধা নাই, সেইজন্য প্রকৃতি দেবী স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের জন্য বায়ু, কীটপতঙ্গাদি বাহনের সাহায্য গ্রহণ করেন।

পুংকেশরমণ্ডল (চিত্রের 3, 4 অংশ)

পুংকেশরই পুষ্পের পুরুষাঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক পুংকেশরই পাতার মত একটি বোঁটা এবং তাহার উপরে একটি ফলক থাকে, ঠিক যেন একটি ক্ষীণদণ্ডের (Filament) (4) সহিত একটি থালী (3) গাঁথা আছে। এই থালিটিকে পরাগধানী (anther) বলে। প্রত্যেক থালির মধ্যে সাধারণতঃ দুইভাগে দুইটি করিয়া কূপ থাকে। প্রতি কূপ অতি সূক্ষ্ম এক পদার্থকণায় কাণায় কাণায় পূর্ণ থাকে। এই পদার্থকণাই ফুলের রেণু বা পরাগ (Pollen, Grain)। কূপে রেণু থাকে বলিয়া উহাকে রেণু-ভাণ্ডার বলা ভুল হয় না। থালি বাড়িবার মুখে এক একদিকের রেণুভাণ্ডারদ্বয়ের মধ্যস্থ পর্দা ফাটিয়া গিয়া কূপ দুইটি এক হইয়া যায় ; ফলে থালির চারিটি কূপ দুইটিতে পরিণত হয়।

গর্ভকেশর (চিত্রের 1, 2, 5 অংশ)

ইহাই উদ্ভিদের স্ত্রী-অঙ্গ। গর্ভকেশর এক বা একাধিক ভাগে বিভক্ত থাকে। এই এক একটি ভাগ গর্ভপত্র (carpel) বলিয়া পরিচিত। পত্রই রূপান্তরিত হইয়া ফুলের পাপড়িতে পরিণত হয়। যে পত্র গর্ভপত্রে পরিণত হয়, উহাতে ভাঁজ পড়িয়া কূপের আকার ধারণ করে; এই কূপকে (5) ডিম্বাশয় (ovary) বলে। ডিম্বাশয়ের শীর্ষদেশ সরু হইয়া একটি ক্ষীণদণ্ডে পরিণত হয়; এই দণ্ডকে (2) গর্ভদণ্ড (Style) বলে।
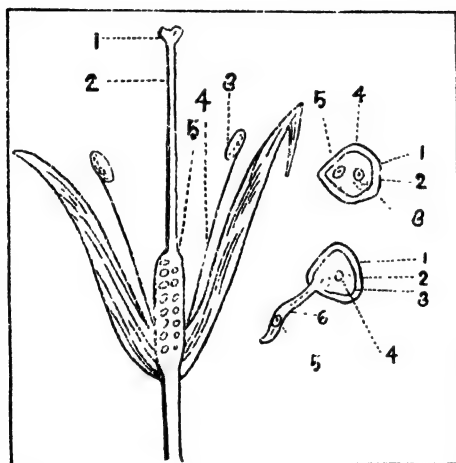
শীর্ষদেশে এই গর্ভদণ্ড বিস্তৃত হইয়া শেষ হয়। গর্ভদণ্ডের এই বিস্তৃত প্রান্তদেশকে (1) গর্ভমুণ্ড (Stigma) বলে। ডিম্বাশয়ের মধ্যে এক বা একাধিক ডিম্বক (ovule) জন্মে। ডিম্বকের মধ্যে একটি ডিম্বাণু (ovum) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রূণকোষে (Embryosac) পরিণত হয়। এই ভ্রূণকোষের মধ্যে ডিম্বাণু জন্মে। পরিণত ডিম্বকই উদ্ভিদের বীজ এবং পরিণত ডিম্বাশয়ই উদ্ভিদের ফল।

রেণুর পরিচয় (দক্ষিণ পার্শ্বের চিত্র)

প্রতি রেণুকণা দুইটি আবরণে আবৃত থাকে। (1) বহিরাবরণটি (exine) অপেক্ষাকৃত কঠিন ; ইহার কয়েকস্থানে ছিদ্র বা কোমল পর্দ্দা থাকে। (2) অন্তরাবরণটি (intine) পাতলা রবারের মত টানিলে বাড়ে। রেণুকণাকে ফুটবল কল্পনা করিলে অন্তরাবরণটি নরম রবারে নির্ম্মিত ব্ল্যাডার এবং বহিরাবরণটি শক্ত চামড়ায় নির্ম্মিত কভার। অন্তরাবরণের মধ্যে সূক্ষ্ম তরল স্বচ্ছ (3) প্রোটোপ্লাজম সযত্নে রক্ষিত থাকে। এই স্বচ্ছরসে দুইটি কঠিন পদার্থ কণা ডুবিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটি রেণুকণার (4) কেন্দ্রস্থ মূল, অন্যটি (5) গর্ভসঞ্চার করিবার মূল।

রেণু ও ডিম্বাণুর সংযোগ

রেণু ও ডিম্বাণু অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত না হইলে বীজ জন্মে না এবং বীজ না হইলে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না। রেণুকোষ পাকিলে ফাটিয়া পড়ে এবং কোষ হইতে রেণু বাহিরে আসিবার পথ পায়। তাহার পর উদ্ভিদের গর্ভাধানের জন্য এই রেণু গর্ভকেশরে পড়া প্রয়োজন এবং রেণু ও ডিম্বাণুর একাকার হইয়া মিলন আবশ্যক।

প্রকৃতি দেবী রেণু ও ডিম্বাণুর সংযোগের ব্যবস্থা নানাভাবে করিয়াছেন। যে সকল বনের গাছে ও ধান গম আদি তৃণজাতীয় উদ্ভিদে ফুল ধরে না, ঐরূপ উদ্ভিদের রেণু বায়ুতে উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ বায়ুভরে ছড়াইয়া পড়িবার সময় দূরে বা নিকটে স্থিত স্ববর্ণ উদ্ভিদের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তা দিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি দেবী এইরূপ উদ্ভিদের ফুলে প্রচুর রেণু সৃষ্টি করেন। রেণুর প্রাচুর্য্যের জন্য ঐরূপ সম্ভাবনা একরূপ নিশ্চয়তায় পরিণত হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেণু ও ডিম্বাণুর মিলন কীটপতঙ্গাদি দ্বারা

সংঘটিত হয়। ফুলের মনোহর রূপ, মন মাতান সুগন্ধ সর্ব্বোপরি লোভনীয় মধুতে আকৃষ্ট হইয়া কীটপতঙ্গাদি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গিয়া উপস্থিত হয় এবং যাতায়তের সময় সম্পূর্ণ আপন অজ্ঞাতেই একের পুংকেশর হইতে রেণু সংগ্রহ করিয়া অন্যের গর্ভকেশরের ডিম্বাণুর নিকট পৌছাইয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের সংযোগ ঘটাইয়া দেয়।

গর্ভসঞ্চার

গর্ভমুণ্ডে একপ্রকার আঠাল পদার্থ মাখান থাকে। বায়ুভরেই হউক বা কীটপতঙ্গাদির দ্বারাই হউক, রেণুকণাগুলি ইহার উপরে আসিয়া পড়িলেই আঁটিয়া ধরে। তখন উহা গর্ভমুণ্ডস্থ রস গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইবার কালে, রেণুকণা মধ্যস্থ প্লোটোপ্লাজম বৃদ্ধি পায়। এইরূপ বৃদ্ধির ফলে অন্তরাবরণটি ব্ল্যাডারের মত ফুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করে; কিন্তু বহিরাবরণটি কঠিন হওয়ায় উহার ছিদ্র বা কোমল স্থান দিয়া ঠেলিয়া একটি শুঁড়ের আকারে বাহিরে আসিয়া পড়ে। ছিন্নকভার ফুটবলের ব্ল্যাডার ফুলিয়া যেরূপ বাহিরে আসিয়া পড়ে, ব্যাপারটি প্রায় অনুরূপই ঘটে। এইটিকে (6) পরাগশুণ্ড (pollen tube) বলা চলে। রেণুকণার পুষ্টির সহিত পরাগশুণ্ডও বাড়িতে থাকে। ইহা বাড়িতে বাড়িতে গর্ভদণ্ডের শিথিল মধ্যাংশে পথ করিয়া একেবারে ডিম্বাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইয়া বীজ উৎপন্ন করে। পরাগশুণ্ডের গর্ভদণ্ডপথে আসিয়া ডিম্বাশয়ে পৌছিতে ঐ পথের দৈর্ঘ্যানুযায়ী সময় লাগে।

ফুলের কাজ কীটপতঙ্গাদিকে লোভ দেখাইয়া লইয়া আসা। উহারা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া ফিরিয়া রেণুকণা গায়ে মাখিয়া ডিম্বাণুর নিকট উপস্থিত হইলে রেণুকণা ও ডিম্বাণুর সংযোগে উদ্ভিদবীজের জন্ম হয়। ফুলের এই কাজ শেষ হইলে উহার মৃত্যু ঘটে।

অধিকাংশ উদ্ভিদে পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই পুষ্পে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিয়া মনে হয়, ডিম্বাণুর সহিত পরাগের সংযোগ ঘটাইবার জন্য বায়ু কীটপতঙ্গাদির মত ঘটকের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মটর তামাকু প্রভৃতি অতি অল্পই চারাতেই এইরূপ যোগাযোগ ঘটিতে দেখা যায়। এইরূপ একই পুষ্পজাত ডিম্বাণুর সহিত পরাগ-

স্ত্রী-পুষ্প ২। পুং-পুষ্প
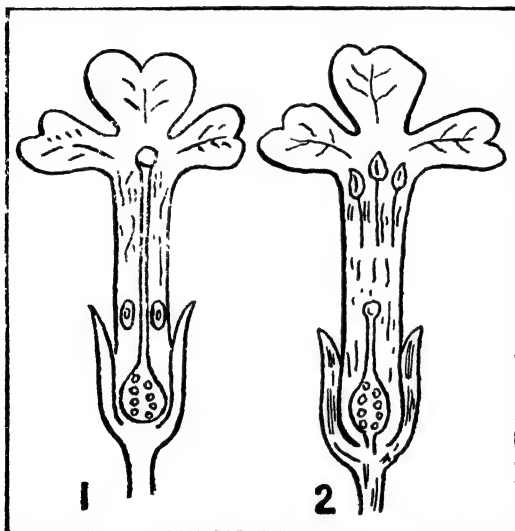
যোগকে স্বকীয় পরাগযোগে (self pollination) বলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরকীয় পরাগযোগই প্রকৃতির রীতি। গর্ভদণ্ডকে উঁচু করিয়া বায়ুভরে নীত বা কীটপতঙ্গাদি কর্তৃক আনীত পরাগ ধরিবার ব্যবস্থা ; বেতারে কথা ধরিবার আকাশতারের মতই বলিয়া মনে হয়।

পরাগবাহন

পরকীয় পরাগযোগের জন্য বাহনের প্রয়োজন। পুষ্পের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বাহন নিযুক্ত করিয়া প্রকৃতি দেবী আপন কার্য্য আদায় করেন। যে ক্ষেত্রে পুষ্প ক্ষুদ্র, অনুজ্জ্বল, বর্ণহীন ও মধুশূন্য, সে ক্ষেত্রে বাহন বায়ু; এই জাতীয় পুষ্প পবনানুরাগী। বায়ুভরে উড়িয়া যাইবার সময় অধিকাংশ রেণুকণা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেইজন্য ঐ সকল পুষ্পে প্রচুর রেণু জন্মায়। উড়িয়া যাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া রেণুকণা হয় মসৃণ, লঘু, শুষ্ক ও ধুলির মত। বায়ুপ্রবাহিত রেণুকণা সহজে ধরিবার জন্য এইজাতীয় পুষ্প হয় দীর্ঘাকার, মণ্ডল হয় তাহার বড় ও লোমে পরিপূর্ণ। ইহারা সাধারণতঃ একলিঙ্গ হয় এবং বায়ুতে বহুক্ষণ ভাসিয়া থাকার সুবিধা হইবে বলিয়া ইহাদের প্রসূত রেণুকণায় পাখা বা একটি বায়ুপূর্ণ থলি সংযুক্ত থাকে। এইরূপ রেণুকণার জুড়ি খুঁজিয়া লইবার জন্য অধিকক্ষণ বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া প্রকৃতির এই ব্যবস্থা।

পেঁপে গাছ এই জাতীয় উদ্ভিদের চমৎকার উদাহরণ। ইহারা এক-লিঙ্গ। স্ত্রী-উদ্ভিদের পুষ্পগুলি হয় বৃন্তহীন, বড়, অনুজ্জ্বল, শ্বেতবর্ণ। ফুলগুলি দুই তিনটি করিয়া এক একটি খাঁজে অবস্থিত। ইহাদের মণ্ডলও হয় বড় ও লোমশ এবং আবরণের বাহিরে থাকে। পুং-উদ্ভিদের (রাঁড়া) ফুলগুলি হয় অপেক্ষাকৃত ছোট, অনুজ্জ্বল, শ্বেতবর্ণ এবং বহু দীর্ঘাকার ঝোলা শীষে অবস্থিত।

ইহারা একলিঙ্গ হওয়ায় স্বকীয় পরাগযোগ অসম্ভব। মটর আদি ব্যক্ত-বীজ উদ্ভিদের অধিকাংশেরই বায়ুস্রোতেই রেণু সমাগম হয়। আম, আমড়া, লিচু, জাম, জামরুল আদি ফলের গাছের পরাগযোগ অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই বায়ু প্রবাহেই হইয়া থাকে। তবে একেবারেই কীটাদি দ্বারা পরাগ যোগ হয় না, একথা বলা বড় শক্ত।

1
2
3
4
5
6
7
8
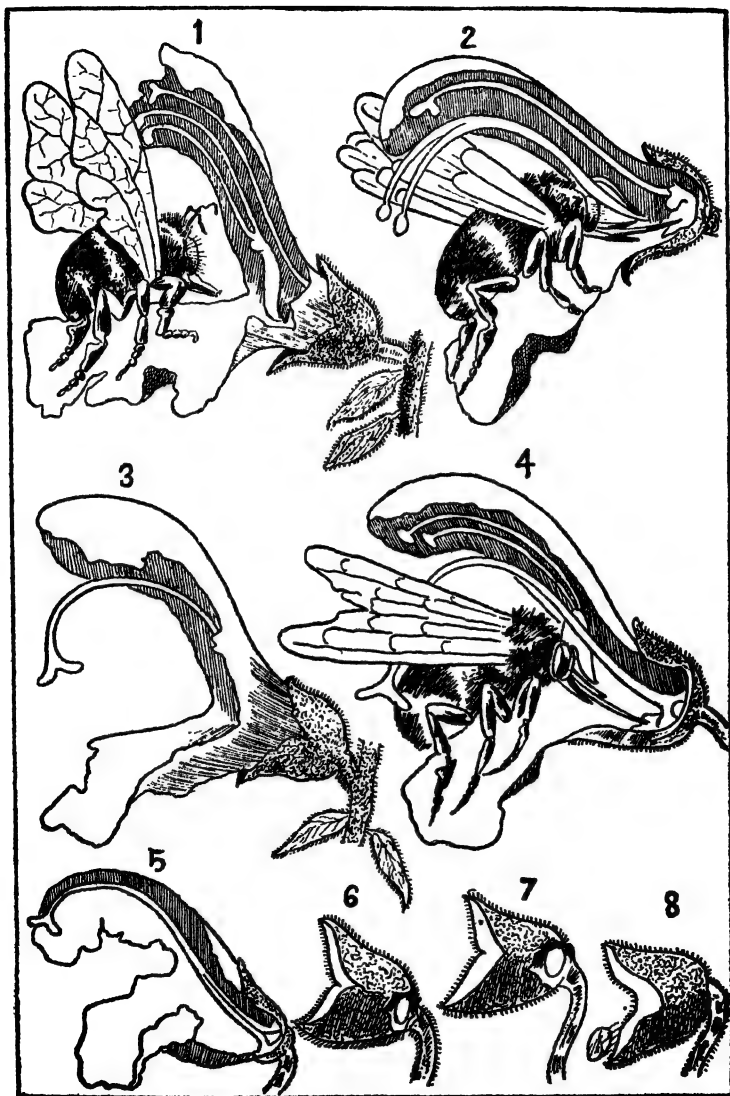
কীটপতঙ্গাদির সাহায্যে যে সকল উদ্ভিদের পরাগ যোগ হয় উহাদের ফুলের রেণু কীটানুরাগী। এই জাতীয় রেণু পবনানুরাগী রেণু অপেক্ষা আকারে বড় হয়। ইহা আঠাল ও কাঁটাল হওয়ায় কীট পতঙ্গের গায়ে সহজেই আঁটিয়া ধরে এবং উহাদের কাঁধে চাপিয়া স্ত্রী-উদ্ভিদের ডিম্বাণুর নিকট উপস্থিত হইতে পারে। কখন কখন রেণুকণাগুলি ধুলির মত না হইয়া সূক্ষ্ম সূতার মত এক পদার্থে লাগিয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে। কীটানুরাগী পুষ্প আপন মনোহর রূপ, সুমিষ্ট রস, মনমাতান গন্ধ দিয়া কীট পতঙ্গকে ডাকিয়া আনে।

শিউলি, যূঁই, রজনীগন্ধা, হাসনাহানার মত পুষ্প রাত্রে ফোটে, এরূপক্ষেত্রে রাত্রিচর কীটের সাহায্যে পরাগযোগ ঘটে।

কাক, শালিক আদি পাখী এবং কাঠবিড়ালী, বাদুড় প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীও পরকীয় পরাগযোগে সাহায্য করে। শিমুলের বড় বড় লাল ফুলে বা বড় কৃষ্ণচুড়ার লাল বড় বড় পুষ্পযুক্ত পুষ্পশাখায় পাখী বা জন্তু আনাগোনা করিয়া যে পরাগযোগে সাহায্য করে, সে বিষযে কোন সন্দেহ নাই।

বায়ুপ্রবাহের ন্যায় জলপ্রবাহও জলজ উদ্ভিদের পরাগযোগে সাহায্য করে। এঁদো পুকুরের ঘাট-শ্যাওলা, এইরূপ পরাগযোগের চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইহারা এক লিঙ্গ। এই উদ্ভিদের মূল পাঁকে পোঁতা থাকে। ইহার বৃন্তহীন পুং-পুষ্প পাতার গোছার মাঝে জলের মধ্যে থাকে। স্ত্রী-পুষ্পও পাতার গোছার মধ্যে জলের মধ্যে থাকে কিন্তু ইহার বৃন্ত দীর্ঘ। পরাগযোগের ক্ষণ উপস্থিত হইলে পুং-পুষ্পগুলি উদ্ভিদ হইতে কাটিয়া পড়িয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে, এবং স্ত্রী-পুষ্পও এই সময়ে জলের উপর দীর্ঘ বৃন্তের জন্য ভাসিয়া উঠায় পরাগযোগ ঘটে।

সবুজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতিদেবী তিনটী উপায় গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তেউড় দ্বারা (vegetative). কলার মত

উদ্ভিদের কাণ্ডের শাখা মাটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালে মাটি ফুঁড়িয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া স্বাধীন চারারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য কলার গাছ বীজ হইতে না চারাইয়া তেউড় পুঁতিয়া কলার চাষ করা হয়। এইরূপে ওল ও কচুর মুকী, হলুদের গেঁড়, আলুর চোখ, আনারসের ঝুঁটি পুঁতিয়া ঐ ঐ জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ অযৌন (a-sexual reproduction) উপায় দ্বারা। যে ক্ষেত্রে জননেন্দ্রিয়ের উন্মেষ ঘটে নাই, সেক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের অঙ্গের একস্থানে একপ্রকার অণ্ড (spore) অসংখ্য সংখ্যায় বিকশিত হয়। এইরূপে বিকশিত উদ্ভিদ অণ্ডগুলি কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে আশ্রয় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া বায়ুভরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর মাটিতে পড়িয়া অনুকূল যোগাযোগে আত্মবিকাশ করে।

আনারসের ঝুঁটি

তৃতীয়তঃ যৌনমিলন (sexual reproduction) দ্বারা। এই উপায়ে পুং-পুষ্পের পরাগযোগে সবর্ণ স্ত্রী-পুষ্পের ডিম্বাণুকে ভবিষ্যবংশীয়ের বীজরূপে পরিণত করা হয়। এই যৌনমিলন সমগোত্রীয় (একই উদ্ভিদ-জাত) হইলে সন্তান জন্মে বটে, কিন্তু দুর্ব্বল ও নির্ম্মম জীবন যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া বিকশিত হয়। ফলে এইরূপে জাত সন্তানের ধারা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না। সেইজন্য দ্বিলিঙ্গ পুষ্প সাহায্যে

স্বগোত্রজনন বিধি তুলিয়া দিয়া প্রকৃতি একলিঙ্গ পুষ্প সাহায্যে ভিন্ন-গোত্রজনন বিধি প্রচলিত করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজননবিধি অতিশয় সরল ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিদেবী যৌনমিলন বিধির মত এমন এক জটিল বিধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদবংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন কেন ?

মেণ্ডেলবাদ (Mendelism)

অষ্ট্রিয়াবাসী এক জার্ম্মাণ পণ্ডিত মটরের জন্ম লইয়া বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া সবুজের যৌনমিলনের রহস্য জানিতে পারেন। যাহা একদিন দুর্জ্ঞেয় ছিল তাহাই আজ মেণ্ডেলের অধ্যবসায় গুণে সকলের সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি লক্ষ করিলেন যে পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানের মধ্যে কতকাংশে দেখা দেয় এবং কতকাংশে দেয় না। তিনি গুণগুলিকে প্রধান (dominant) ও অপ্রধান (recessive) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাজাইলেন। প্রধান গুণগুলি সন্তানে দেখা যায় এবং অপ্রধান গুণগুলি সন্তানে বিকশিত না হইলেও বংশধারার কোন না কোন আধারে পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিলে ফুটিতে দেখা যায়। পূর্ব্বপুরুষের গুণাগুণ এক বংশধারার আধারের কোনটীতে দেখা যায় আবার উহার কোনটীতে চাপা পড়িয়া যায়। পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানে দেখা যাওয়া ও চাপা পড়া একটা বিশেষ উত্তরাধিকার সূত্রানুযায়ী ঘটে। এই গুণাগুণ উত্তরাধিকার সূত্র বিদ্বৎসমাজে মেণ্ডেলবাদরূপে পরিচিত।

মেণ্ডেল মহাশয় মটরকড়াই লইয়া বহু বৎসর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিলেন যদি সবুজ গোলাকার (1) মটরকড়াই গাছের ডিম্বাণুর সহিত পীতবর্ণের কোঁচকান (2) মটরকড়াই গাছের পরাগযোগ ঘটান হয়, তাহা হইলে ঐ ডিম্বাণু হইতে যে মটরকড়াই পাওয়া যাইবে উহার আকার হইবে (3) গোল এবং রঙ হইবে পীত। তাহা হইলে উত্তরাধিকার

সূত্রানুযায়ী বুঝা গেল গোলত্ব আকারের মধ্যে প্রধান হওয়ায় সন্তানে উহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং কুঞ্চিত আকার অপ্রধান গুণরূপে বিবেচিত হওয়ায় উহা সন্তানে অব্যক্ত রহিয়া গেল। রংএর মধ্যে পীত রং প্রধান বলিয়া
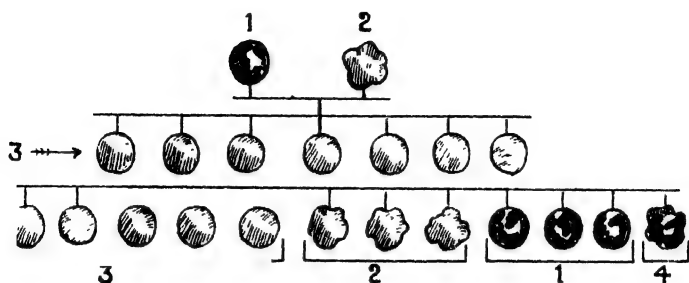
উহা সন্তানে ফুটিয়াছে, সবুজ রং অপ্রধান বলিয়া ফুটে নাই, চাপা পড়িয়াছে। এইরূপ মিলন অসবর্ণ মিলনের মত বলিয়া এইরূপ মিলন জাত সন্তানকে আমরা বর্ণসঙ্কর বলিব।

বর্ণসঙ্করের মধ্যে মিলন ঘটাইলে উহাদিগের সন্তানদের মধ্যে কতকগুলি হয় পিতামাতার মত (৩) পীতবর্ণ ও গোলাকার, কতকগুলি হয় ঠাকুর-দাদার মত (২) পীতবর্ণ ও কুঞ্চিতাকার, কতকগুলি হয় ঠাকুরমার মত (1) সবুজ ও গোলাকার; ইহা ব্যতীত আর একজাতি নূতন বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়, ইহার (4) আকার হয় কুঞ্চিত ও বর্ণ হয় সবুজ।

পিতা ও মাতার প্রধান গুণগুলি সন্তানে বিকশিত হয় বলিয়া উহারা প্রতিকূল যোগাযোগেও বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিলাভ করে। নিষ্মম জীবন যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন; স্বগোত্রজননে এরূপ শক্তিলাভ হয় না, সেইজন্য প্রকৃতিকে এই জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

৯

সবুজের বংশবিস্তার কৌশল

সৃষ্টিচক্রে এক অপরকে খাইয়া আপন দেহ গঠন করে। প্রাণি-জগতের জীবদিগের চলৎশক্তি থাকায় নানা উপায়ে খাদকের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে পারে; কিন্তু বেচারী সবুজ চলৎশক্তিহীন, ফলে উহার পলাইয়া বাঁচিবারও উপায় নাই। অথচ উহার খাদকেরও অভাব নাই, কিন্তু আশ্চর্য্য উপায়ে সবুজ আপনাকে রক্ষা করিয়া বংশ বিস্তার করে।

সবুজের বীজ হইতে উহার ভবিষ্যৎ বংশধর জন্মায়। এই বীজ অধিকাংশই আবার বহু জীবের অতি সুস্বাদু আহার্য্য। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও সবুজ আপন ভবিষ্যৎ বংশধারা বজায় রাখিবার জন্য বীজ ছড়াইবার আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করে।

পাখাযুক্ত বীজের নমুনা

বীজগুলির মধ্যে কতকগুলি এমনই ক্ষুদ্র ও লঘু যে ফল পাকিয়া ফাটিয়া গেলে ঐগুলি বায়ুভরে বহু দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া আত্মগোপন করিবার সুযোগ পায় এবং সময় উপস্থিত হইলে উপযুক্ত যোগাযোগে ঐ বীজ হইতে নূতন চারা জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু অধিকাংশ বীজ এত লঘু হয় না। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সঙ্গে পাখীর ডানার মত পাখা থাকে। ঐরূপ পাখা থাকায় ঐ জাতীয় বীজের পক্ষে বায়ুভরে জন্মস্থান হইতে দূরে ছড়াইয়া পড়া সহজ হয়।

বীজের এই পাখাগুলি নানা আকারের। কিন্তু প্রত্যেকেরই গঠন এমন যে বায়ুভরে বহু উচ্চে নীত হইলেও মাটিতে পড়িবার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে পড়ে; ফলে বীজে আঘাত লাগিয়া উহার প্রাণশক্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কতকগুলি সবুজের ফল সশব্দে ফাটিয়া গিয়া উহাদিগের বীজগুলি তীরবেগে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সবুজ অতিশয় অসহায় বলিয়া উহার

বংশ বাঁচাইবার জন্য বীজ জন্মায় অসংখ্য। এই অসংখ্য বীজ যদি সবুজের আশে পাশে পড়ে তাহা হইলে এত চারা জন্মাইবে যে স্থান ও খাদ্যাভাবে সকলগুলিই মরিয়া যাইবে সেইজন্য বীজ ছড়াইবার এই ব্যবস্থা। জঙ্গম-জীব যেমন স্থান ও খাদ্যের অভাব হইতে বাঁচিবার জন্য নূতন স্থানে গিয়া

উপনিবেশ স্থাপন করে ; স্থাবর-জীব সবুজের বেলায় নানা উপায়ে উহার বীজ অনুরূপ উদ্দেশ্যেই দূরদূরান্তরে ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাঠে বেড়াইবার সময় দেখা যায় কাপড়ে কাঁটার মত কি লাগিয়াছে। অসহায় সবুজের আপন বীজ দূরে পাঠাইবার ইহা এক কৌশল। এই জাতীয় সবুজের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমাদের কাপড়ে বা জীবজন্তুর গায়ে ইহাদের বীজ লাগিয়া যায় এবং এইরূপে জন্মস্থান হইতে নূতন স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়।

কতক সবুজের ফল এমনই সুস্বাদু যে মানুষ, পাখী বা জন্তু কেহই খাইতে ছাড়ে না। কিন্তু ইহাদের বীজ অতি দুষ্পাচ্য আবরণে ঢাকা থাকায় ফলের সহিত উহা জীবের পেটে গিয়াও হজম হয় না, জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত মলের সহিত ঐ বীজগুলি বাহির হইয়া আসে। পেয়ারার বীজ এই জাতীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাখীতে ফল খাইয়া অন্যত্র গিয়া মলত্যাগ করে এবং সেই সঙ্গে দুষ্পাচ্য বীজগুলি উহার পেট হইতে বাহির হইয়া নূতন স্থানে উপনিবেশ গড়িবার সুযোগ পায়।

এই উপায়ে প্রকৃতিদেবী অতি সহজেই জীবের আহারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন এবং সেই সুযোগে নিরীহ সবুজের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থাও করিতে ভুলেন নাই ; এ যেন এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা। প্রকৃতির সকল কাজেই একটির সহিত অপরটির সম্পর্ক থাকায় তাঁহার সকল ব্যবস্থাই স্বয়ম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ।

সবুজের জন্ম

প্রাণমাত্রেরই লীলার জন্য বায়ুর প্রয়োজন। যে স্থানেই প্রাণের লীলা চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই বায়ু উপস্থিত আছে বুঝিতে হইবে। বীজের বেলাতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। বায়ু-শূন্য আধারে বীজ রাখিলে উহা অচিরে দম বন্ধ হইয়া মারা পড়ে। তখন উহাকে বপন করিলে উহা হইতে চারা গজায় না।

বীজের মধ্যে ধানের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বায়ুর প্রয়োজন হয়। সবুজ-ভ্রূণের আহার বীজের মধ্যেই থাকে। মাটিতে বপন করিলে ভ্রূণ হইতে চারা জন্মিবাই কিছু মাটি হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে না। তখন সবুজ-ভ্রূণ বীজমধ্যস্থ খাদ্য খাইয়া প্রাণধারণ করে। ভ্রূণের বাড়িবার মুখে উহার আহারের প্রয়োজন হয়, তখন ক্রমশঃ উহা মাটি হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

বীজের মধ্যে সবুজের প্রাণ যেন সুপ্ত থাকে। নিদ্রাকালে প্রাণের লীলা স্তব্ধ থাকে মাত্র; তখন আমাদের মতই উহার আহারের অভাব অনুভব হয় না, কিন্তু বায়ুর প্রয়োজন থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ তাপ, জল ও বায়ুর সাহায্যে সবুজ ভ্রূণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। অত্যধিক বা অত্যল্প জল, বায়ু ও তাপে সবুজ ভ্রূণ জাগে না, আর জাগে না আলোকে। আলোকের সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে জল, বায়ু ও তাপের যোগাযোগ একমাত্র মাটির গর্ভেই সম্ভব, তাই মাটিতে বীজ বপন করিয়া সবুজ-ভ্রূণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। বীজে কলা দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত

ভ্রূণের নিদ্রাবস্থা বলা চলে ; এই অবস্থায় ভ্রূণ বায়ুভূক। প্রতি জাতীয় সবুজ-ভ্রূণের এইরূপে বীজমধ্যে বায়ুমাত্র গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ু আছে ; চারান না হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট আয়ুশেষে বীজস্থ ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে, তখন বপন করিলে উহা হইতে আর চারা বাহির হয় না।

নিদ্রাভঙ্গে ভ্রূণ জাগিয়া উঠিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে বীজমধ্যস্থ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া উহা আপন দেহ রচনা করে ; তাহার পর ক্রমশঃ উহা মাটি হইতে প্রয়োজন মত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া বাড়িতে থাকে। সবুজের ভ্রূণাবস্থাতেও দিকজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বীজ যেরূপ ভাবেই বপন করা হউক না কেন উহা হইতে প্রথমে মূল বাহির হইলে ঐ মূলটী নিম্নাভিমুখী হয়। এইরূপ না হইলে বীজ হইতে চারা জন্মিলেও উহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত না। মাটিতে মূল না প্রবেশ করিলে বীজমধ্যস্থ খাদ্য শেষ হইলে সবুজ-শিশু খাদ্যাভাবে মারা পড়িত। ভ্রূণের মূল যেমন নিম্নাভিমুখী হইতে ভুল করে না, উহার কাণ্ডও তেমনি ঊর্দ্ধাভিমুখী হইতে কখনও ভুল করে না।

চারা ক্রমশঃ মাটির মধ্যে মূল বিস্তার করিয়া প্রয়োজন মত খাদ্য সংগ্রহান্তে পরিপাক করিয়া কাণ্ড ও পত্রে পরিণত করে। চারা বাড়িয়া নিম্নে আপন মূল বিস্তার পূর্ব্বক মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ঊর্দ্ধে কাণ্ড ও পত্র লাভ করার সময়ের মধ্যে আহার সংগ্রহ করিতে ও দেহ রচনা করিতে শিখিয়াছে। ইতিমধ্যে উহার বীজমধ্যস্থ সঞ্চিত আহার্য্য শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মাটির ও বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারায় উহার বাঁচিবার ও বাড়িবার পক্ষে কোন অন্তরায় ঘটে না।

আলোক উদ্ভিদ-ভ্রূণের ঘুম ভাঙ্গাইবার অন্তরায় হইলেও নিদ্রাভঙ্গের পর উহা আলোক রশ্মিকেই অনুসরণ করিয়া ঊর্দ্ধ বা অধোদিক নির্ণয়

করিতে সমর্থ হয়। এমন কি চারাকে কোন অন্ধকার আধারে বাড়িতে দিয়া ক্ষীণ আলো আসিবার আঁকা বাঁকা পথ রাখিয়া দিলে দেখা যায় চারার উর্দ্ধাংশ ঠিক ঐ আঁকা বাঁকা পথেই ক্ষীণ আলোক রেখাকে অনুসরণ করিয়াই বাড়িয়া চলিয়াছে। চারার এরূপ গতি দেখিয়া মনে হয় যেন উহার দেখিয়া পথ চিনিবার মত কোন ইন্দ্রিয়ের ব্যবস্থা আছে।
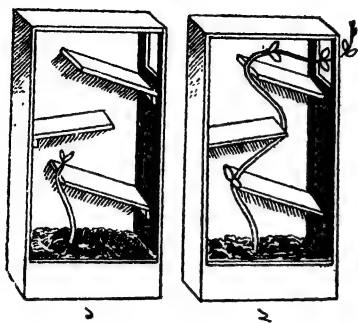
১১

সবুজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ক। মূল

উদ্ভিদ জন্মিয়াই দুইটি মুখে বাড়িতে আরম্ভ করে। একটি মুখ ভূমধ্যে নামিয়া যায়, এইটীকে মূল (root) বলে; অপরটী উর্দ্ধদিকে বাড়ে, এইটীকে পল্লব (shoot) বলা চলে। মূলটী ভূমধ্যে অগণিত শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া বাড়িতে থাকে। মাটির মধ্যে ইহাকে বহু বাধা বিঘ্ন পার হইতে হয় বলিয়া কচি মূলের অগ্রভাগ একটা শক্ত খাপে ঢাকা থাকে।

ভূগর্ভে মাটির ফাঁকে ফাঁকে খাপবদ্ধ মূলাগ্র ধীরে ধীরে পথ করিয়া অগ্রসর হয়। মূলাগ্রের ঠিক পিছনে মূলের গায় কেশের ন্যায় অসংখ্য
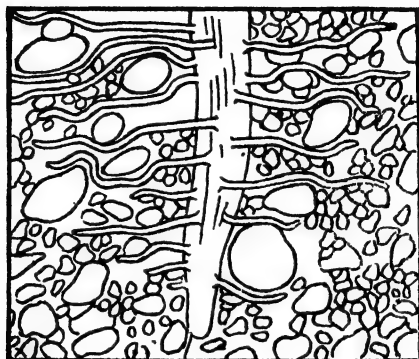
সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মূল জন্মায়। এই মূল-কেশগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাটির কণা জড়াইয়া থাকে। এইগুলি হইতে এক প্রকার আঠাল রস ক্ষরণ হয়, এই রসের আঠায় উহার মাটি কামড়াইয়া থাকার সুবিধা হয়।

মূল-কেশগুলি দিয়াই সবুজ মাটি হইতে রসাকারে চুষিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে। মাটির এমন উদ্ভিদ খাদ্যও আছে যাহা জলে গলিয়া রসাকার প্রাপ্ত হয় না, এইগুলিকে গালাইয়া রসাকারে পরিণত করিবার জন্য মূল-কেশগুলি হইতে অম্লরসের ক্ষরণ হয়। এই অম্লরসে জরিয়া ঐ প্রকার ধাতব পদার্থ রসাকারে পরিণত হইলে মূলকেশ উহা চুষিয়া লইতে পারে।

আদি মূল বাড়িয়া ক্রমশঃ নানা আকার ধারণ করে। মূলা, গাজর, শালগম, বীটপালঙের মূল এক জাতীয়। পিয়াজ, রসুন, তালখর্জ্জুরাদিতে এক প্রকার গোছা মূল জন্মায়। এইগুলির মূল শেষ পর্য্যন্ত সরুই থাকে

মোটা হয় না ; কিন্তু অধিকাংশ বড় বড় গাছের মূল বাড়িবার মুখে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্থূলাকার ধারণ করে।

ঊর্দ্ধাংশ হইতে মূল জন্মিতেও দেখা যায়। বটগাছের ঝুরি ইহার চমৎকার উদাহরণ। এইরূপ মূল প্রকৃতির ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরা উচিত। কেয়া আদি বৃক্ষের শাখা হইতেও এইরূপ ঝুরি-মূল নামিতে দেখা যায়। পাথরকুচির পাতা হইতেও ঝুরি-মূল জন্মে।

মূল সাধারণতঃ মাটির ভিতরের দিকে বাড়িয়া উদ্ভিদকে মাটির উপরে জল ঝড়ের ঝাপটাতেও দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহায্য করে। মাটির সহিত সম্পর্ক নাই অন্যান্য গাছকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণ শূন্যে ঝুলিয়া থাকে

এরূপ উদ্ভিদও বিরল নহে। জলে মূল ছড়াইয়া থাকে মাটি স্পর্শ করে না, পাণিফল লতার মত এরূপ উদ্ভিদ বহু আছে।

সুন্দরবনের মত জলাভূমির মাটি বারমাস জলে পূর্ণ থাকে এবং সেই স্থানে সুঁদরি আদি বৃক্ষের মূল আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক অভিনব উপায় অবলম্বন করে। এইরূপ গাছের মূলাগ্র মাটি হইতে বাহিরে আসিয়া উর্দ্ধপথে শূন্যে অবস্থান করে। এইরূপ বহিঃস্থিত মূলাগ্র একটি দৃঢ় খাপে ঢাকা থাকে এবং এইরূপ খাপের গায় বায়ু চলাচলের জন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রপথে বায়ু প্রবেশ করিতে পায় বলিয়া জলাভূমিতেও ঐ প্রকার গাছ বায়ুর অভাবে মারা পড়ে না। এইরূপ উর্দ্ধমুখী মূলাগ্রগুলি আমাদের নাসিকার মত কাজ করে। অবস্থাভেদে বুদ্ধিমান জীব যেমন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, সবুজও যে সেইরূপ অবস্থানুযায়ী বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে পারে ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মূলা গাজর আদি স্থূলমূল সবুজ শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ। আমাদের দেশের মত ইহারা ফুল ও ফল প্রসব করিবার সময় পায় না; এইগুলি
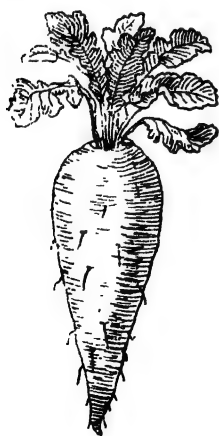
বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই শীত আসিয়া পড়ায় পাতাগুলি শুকাইয়া যায়। সেইজন্য এই জাতীয় সবুজ তাড়াতাড়ি শীতের খোরাক মূলে সংগ্রহ করিয়া লয় বলিয়া মূল ফুলিয়া উঠে। তাহার পর শীত আসিয়া পড়িলে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু উদ্ভিদের মূল মাটির মধ্যে গরমে জীবিত থাকে। শীতকাল উহারা মাটির মধ্যে এক রকম ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহার পর শীত শেষে জাগিয়া উঠিয়া মূল-সঞ্চিত প্রচুর আহার্য্যের সাহায্যে তাড়াতাড়ি ফুল, ফল ও বীজ প্রসব করিয়া জীবলীলা শেষ করে।

শীতপ্রধান দেশে এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে ঐ প্রকার সবুজের বংশ লোপ হইত। আমাদের দেশে সময় পাওয়ায় উহাদের একেবারেই মূল হইতে আরম্ভ করিয়া বীজ পর্য্যন্ত বিকশিত হয়। শীতপ্রধান দেশে বসন্ত-কাল অতি অল্পকাল স্থায়ী, এই অল্প সময়ের মধ্যে মূল হইতে বীজ পর্য্যন্ত বিকশিত হওয়া সম্ভব নহে; সেই জন্য উহারা শীতের মাঝে বাচিবার জন্য মাটির মধ্যে মূলে আহার সঞ্চয় করিয়া রাখে। সবুজ যে একেবারেই অবুঝ নহে তাহা তাহাদের এই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাতেই বুঝা যায়। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বুদ্ধির লক্ষণ।

খ। কাণ্ড

উদ্ভিদচারা বাড়িবার সময় উহার পল্লবাংশ উর্দ্ধদিকে বাড়ে। মূল যেমন পাতালে প্রবেশ করে, পল্লবাংশ তেমনি আকাশে উঠিতে থাকে। উদ্ভিদের এই দুই অংশে কয়েকটী বিশেষ প্রভেদ লক্ষ হয়।

মূলের মতই কাণ্ড বাড়িয়া শাখা ও প্রশাখা বিস্তার করে; মূলে কিন্তু কাণ্ডের মত পত্র ও পুষ্প জন্মে না। মূলের অগ্রভাগকে শক্ত মাটির মধ্যে বহু বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হয় বলিয়া উহার মূলাগ্র একটী দৃঢ় কোষে আবদ্ধ থাকে এবং এই কোষবদ্ধ মূলাগ্রের ঠিক পিছনেই রস পান করিবার জন্য মূলকেশ জন্মায়; কাণ্ড আকাশে বাড়ে বলিয়া বিশেষ কোন বাধা পায় না, সেইজন্য ঐরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ অবস্থায় কাণ্ডের অগ্রভাগের পক্ষে কচিপাতার আবরণই যথেষ্ট, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে অবস্থাভেদে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

শীতপ্রধান দেশে সবুজকে অতিরিক্ত শীত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় বলিয়া উহাদের পল্লবাংশের কোমল অগ্রভাগ শীতকালে পত্রগুচ্ছের বাহিরে শীতসহনক্ষম আর এক বিশেষ ধরণের পত্রদ্বারা আবৃত থাকে।

শীতের শেষে উহার কার্য্য ফুরাইলে উহা ঝরিয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এইরূপ রক্ষী পত্রের প্রয়োজন হয় না বলিয়া সচরাচর দেখাও যায় না।

পত্রে ঢাকা কাণ্ডের বাড়ন্ত অগ্রভাগের নাম মুকুল। কাণ্ডের অগ্রাংশে জাত মুকুলের মত পত্র ও কাণ্ডের সন্ধিস্থলেও (পত্রকক্ষে) মুকুল জন্মে। প্রথমটীকে শীর্ষমুকুল এবং শেষেরটীকে পার্শ্বমুকুল বলে। শীর্ষমুকুল বাড়িয়া কাণ্ড দীর্ঘ হয় এবং পার্শ্বমুকুল বাড়িয়া শাখা প্রশাখায় পরিণত হয়। পার্শ্বমুকুল না বাড়িলে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা জন্মে না. তাল খেজুর নারিকেল আদি পামজাতীয় সবুজ শাখাপ্রশাখাহীন উদ্ভিদের উদাহরণ।

পার্শ্বমুকুল পত্রের কক্ষে পরে পরে বিকশিত হয়। কখন কখন এইরূপ মুকুল বাড়ে না বা ঘুমাইয়া থাকে, পরে প্রয়োজন হইলে বিকশিত হইয়া শাখাপ্রশাখায় পবিণত হয়। পত্রকক্ষ ভিন্ন কাণ্ডের অন্যস্থান হইতে বা মূল হইতে, এমন কি পত্র হইতেও মুকুল ফুটিতে দেখা যায়। এইগুলিকে ব্যতিক্রম বলিযাই ধরা হয়। পটল গাছের মূলে এইরূপ অনিয়মিত মুকুল জন্মে, সেইজন্য চাষীরা পটলের মূল কাটিয়া জমিতে বসায়। পরে এই কাটা মূলের অনিয়মিত মুকুল বাড়িয়া নূতন পটল গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচির পাতার প্রান্তদেশ হইতে এইরূপ অস্বাভাবিক মুকুল জন্মে বলিয়া ইহার পাতা কাটিয়া রোপণ করিলে কালে ঐ পত্রস্থ মুকুল বিকশিত হইয়া নূতন পাথরকুচি গাছ উৎপন্ন হয়। পেঁপে গাছের মত উদ্ভিদের মাথা কাটিয়া দিলে বাকি কাণ্ড হইতে আবার নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পূর্ব্বোক্ত সুপ্ত মুকুল প্রয়োজন হওয়ায় এইরূপ ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া নূতন শাখাপ্রশায় পরিণত হয়।

মূল যেমন কতকক্ষেত্রে বট গাছের ঝুরির মত শূন্যে জন্মে ও বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কোন কোন সবুজের কাণ্ডও উর্দ্ধদিকে না বাড়িয়া মাটির মধ্যে বাড়িতে থাকে। এইরূপ পোঁতা কাণ্ডকে সাধারণ লোকের উদ্ভিদের মূল বলিয়া ভ্রম করা আশ্চর্য্য নয়। আকাশে সঞ্চরণকারী সবুজের

উর্দ্ধাংশের মতই এইরূপ কাণ্ডেও পত্র ও মুকুল ধরে। এই পাতাগুলি সূর্য্যের আলো না পাওয়ায় সবুজ হইতে পায় না। এইরূপ পত্রকক্ষজাত মুকুল সময়মত বাড়িয়া মাটি ভেদ করিয়া শূন্যে উঠে এবং কালে পত্র পুষ্প ফল প্রসব করিয়া জীবলীলা শেষ করে। কিন্তু মাটির মধ্যস্থিত কাণ্ড মাটির মধ্যেই বাড়িতে থাকে এবং সময় সময় উহা হইতে পুনরায় নূতন তেউড় বাহির হইয়া উপরে উঠে। কলাগাছের কাণ্ড এই জাতীয়। এই জাতীয় কাণ্ড যতদিন মাটির তলে জীবিত থাকে ততদিন উহা এইরূপ তেউড় প্রসব করে। সেইজন্য কলাগাছের গোড়ায় তেউড়ের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে কতক তুলিয়া অন্যস্থানে পুঁতিতে হয়, তাহা না হইলে খাদ্যাভাবে ভাল ফল হয় না। এই জাতীয় উদ্ভিদ তাহার ভূমধ্যস্থ কাণ্ডে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে, সেইজন্য ক্রমাগত বহু তেউড় বাহির হইলেও খাদ্যাভাব ঘটে না।

বিভিন্ন সবুজের এই ভূমধ্যস্থ কাণ্ড বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। আদা, হলুদ আমাদের অতি পরিচিত মশলা। ইহাদের কাণ্ড শায়িত অবস্থায় থাকে। মানকচুর ভূমধ্যস্থ কাণ্ড বাড়িবার মুখে উপরের দিকে ঠেলিয়া আসে। ওলের কাণ্ড প্রায় গোলাকার হয়, ইহাদের গায়ের মুকুল বা মুকা লইয়া রোপণ করিলে নূতন গাছ পাওয়া যায়।

আলুও আলুগাছের ভূমধ্যস্থ কাণ্ড বই আর কিছুই নহে। মাটির মধ্যে এই কাণ্ড হইতে শাখাপ্রশাখা জন্মে এবং ঐগুলি মাঝে মাঝে খাদ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডাররূপে ফুলিয়া উঠিয়া কন্দে

সবুজের প্রান্তদেশগুলি বাড়িতে আরম্ভ করে। মাটি হইতে রস সরবরাহ আরম্ভ হইলেই ঝরা পাতার স্থানগুলিতে আবার পাতা গজায়। তাহার পর পাতায় পাতায় সবুজের আহার্য্য পাক আরম্ভ হয়। প্রথমেই এই খাদ্য পাতার বর্দ্ধন ও পুষ্টিতে ব্যয়িত হয়; তাহার পর ক্রমশঃ পাতার
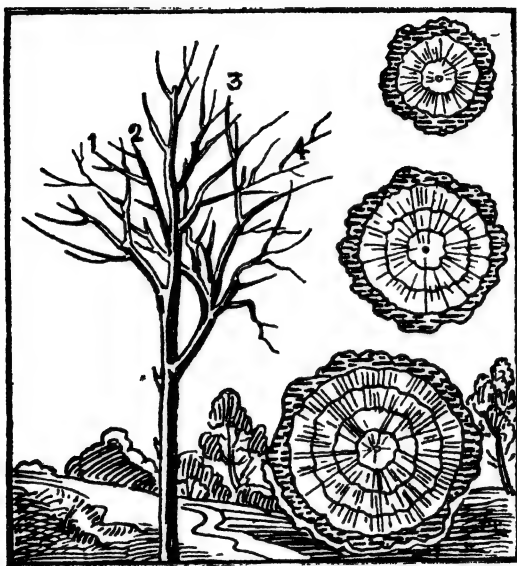
বামে—শীতের শেষে গাছ ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি স্থানে বাড়িতে আরম্ভ করে। দক্ষিণে—গোলাকার দাগের সংখ্যা হইতে গাছের বয়স জানা যায়।

আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজের জন্য পক্ক আহার্য্যও বাড়িতে থাকে। এইরূপে পাতাগুলির সম্পূর্ণ পুষ্টি হইবার পরেও খাদ্য উদ্বৃত্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে সবুজের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা উহা পাইতে থাকে। তাহার পর উহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি আরম্ভ হয়।

গ। পত্র

কাণ্ডের গায়ে পরে পরে পাতাগুলি বিকশিত হয়। ভ্রূণের পত্রকে বীজপত্র এবং ভূমধ্যস্থ কাণ্ডের পত্রকে শল্ক বলে। পত্রই পরে পুষ্পে রূপান্তরিত হয়। কলা, তাল, নারিকেল আদি উদ্ভিদের পাতা নিম্নাংশে কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বিকশিত হয়। পাতার এই নিম্নাংশকে বৃন্তকোষ বলিলে উহার ঠিক উপরিভাগকে বৃন্ত বলা চলে, তাহার উপরের অংশকে ফলক বলা হয়। কলা আদি গাছের পাতা তিনটি অংশে বিভক্ত, বৃন্তকোষ, বৃন্ত ও ফলক।

অধিকাংশ গাছের পাতায় বৃন্তকোষ থাকে না, কেবল মাত্র বৃন্ত ও ফলক দেখা যায়। আবার আখ, বাঁশ প্রভৃতি তৃণজাতীয় গাছের পাতায় বৃন্তকোষ ও ফলক দেখিতে পাওয়া যায়, বৃন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

পত্রের ফলকাংশকেই আমরা সাধারণতঃ পাতা বলি। এই ফলকের আকার নানাবিধ হইয়া থাকে। পত্রের মধ্যে পদ্মের আকার গোল, বাঁশের পাতার বল্লমের ফলার মত, পানের হরতনের টেক্কার মত ইত্যাদি। ফলকের কিনারাও নানাপ্রকারের হয়, আনারসের পাতার কিনারা করাতের মত, কোনটি সুঁচাল, কোনটি ঢেউ খেলান, আবার কোনটি সরল।

কাণ্ডের গাঁটে গাঁটে চারিদিক বেড়িয়া পত্র দেখা দেয়। এই পত্রগুলি এমন ভাবে বাহির হয় যাহাতে একটি পাতা আর একটি পাতাকে ঢাকিয়া না ফেলে। ঢাকিয়া ফেলিলে যে উদ্দেশ্যে পাতার জন্ম উহা ব্যর্থ হইবে। সূর্য্যের আলো পাতার উপর পড়া চাই তাহা না হইলে উহার জন্ম বিফলেই যাইবে।

পত্রের কার্য্য

আমরা পাক করি কাঠ বা কয়লা জ্বালাইয়া আগুনে; মূলে কাঠে বা

কয়লায় সঞ্চিত অগ্নি সৌরতেজের রূপান্তর মাত্র। সবুজ আদিজীব; উহাকে আদি সৌরতেজেই পাক করিতে হয়। পাতাই উহার পাকগৃহ। গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইলে গাছের খাদ্যাভাব ঘটিয়া উহার বাড় বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে খনার বচনে কলাগাছের বাড়ের মুখে কলাপাতা কাটা বারণ আছে। সূর্য্যতেজে পাক হয় বলিয়া গাছের পত্রের সমষ্টি আয়তন অনুযায়ী পরিমাণে খাদ্য পাক করা সম্ভব হয়।

সারাল মাটিতেও ছায়া পড়িলে ভাল শস্য হয় না। উহার একমাত্র কারণ প্রয়োজন মত সূর্য্যতেজের অভাব। প্রচুর খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পাক হয় না, ফলে শস্য জন্মায় না। প্রয়োজনমত জ্বালানীর অভাবে আমাদের খাদ্যপাকের যে দশা হয়, সৌরালোকের অভাবে গাছেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। তবে কোন গাছের পাতাগুলির সমষ্টি-আয়তন যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলে অল্প আলোকে বা ছায়াতেও উহার প্রয়োজনমত খাদ্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। প্রতি পাতায় কিছু কিছু খাদ্য প্রস্তুত হইলে বহুস্থানে কিছু কিছু খাদ্য পাক হওয়ায় একস্থানে প্রচুর খাদ্য পাকের সমতুল হইয়া দাঁড়ায়; সেইজন্য গাছের আহারের কোনই অভাব ঘটে না। এই কারণে ছায়ায় আনারস, হলুদ, কলা, মানকচু আদি বৃহদাকার পাতা-বহুল উদ্ভিদের বাড়ের কোনই অসুবিধা হয় না। ছায়ায় বা অল্পালোকে পাক হইলে খাদ্য তেমন সুন্দর পাক না হওয়ায় উহাদের ফল তেমন সুস্বাদু বা মিষ্ট হয় না। উন্মুক্ত স্থানে রৌদ্রে ইহারা অবশ্য আরও সুন্দর আহার্য্য পাওয়ায় পূর্ণাঙ্গরূপে বাড়ে এবং ফলের আস্বাদও বেশ হয়।

সবুজের পাকপ্রণালী অতি চমৎকার। চিত্র সাহায্যে উহা বুঝিতে হইবে। পত্রের বহিরাবরণের নিম্নে কতকগুলি কোষ থাকে। এই কোষে ক্লোরোফিল (chlorophil) নামে এক সবুজ উপাদান জন্মায়। পত্রের বহিরাবরণ প্রায় স্বচ্ছ হওয়ায় সূর্য্যালোকে উহা ভেদ করিয়া উক্ত
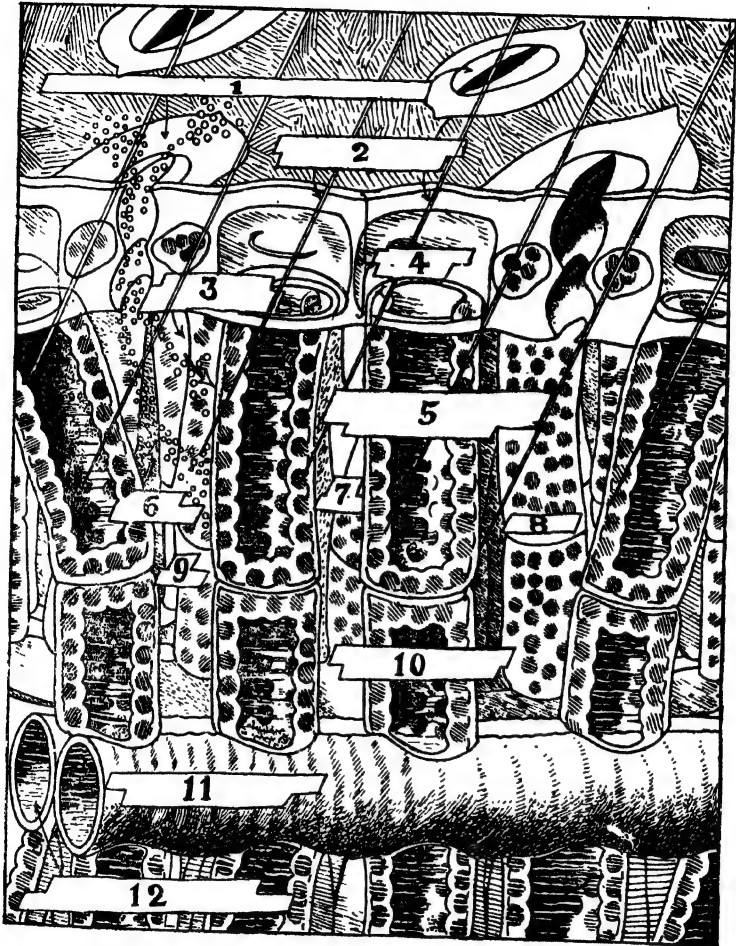
সবুজ পাতার অতি বর্দ্ধিতরূপ পত্রাংশের পরিচয়

১। এই মুখ (Stoma) দিয়া পরিত্যক্ত গ্যাস বাহির হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্যাস প্রবেশ করে।

সবুজ উপাদানকে সক্রিয় করিয়া তোলে। পাতায় অসংখ্য দ্বার (stoma) থাকায় সবুজ উহা দিয়া বায়ুমণ্ডলের কার্বন-দ্বি-অক্সাইড গ্যাস নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করে। অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নালীপথে গাছ মাটি হইতে রসাকারে আপন পুষ্টির উপযুক্ত আহার্য্য টানিয়া আনিয়া আপন পাকঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। এইস্থানে ক্লোরোফিল ঐ রসে গুলিয়া আনীত খনিজ লবণাদি এবং কার্বন-দ্বি-অক্সাইড ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গাছের ষ্টার্চ আদি খাদ্য প্রস্তুত করে। এইরূপে খাদ্য প্রস্তুতের ফলে গাছ পায় তাহার আহার্য্য এবং কার্বন-দ্বি-অক্‌সাইড হইতে অক্‌সিজেন পায় মুক্তি। এইরূপ ব্যবস্থায় কার্বন-দ্বি-অক্‌সাইড বহুল বায়ুমণ্ডল হইতে উক্ত গ্যাসের ভাগ যেমন কমে, অন্যদিকে অক্‌সিজেনের ভাগ তেমনি বাড়ে; ফলে উভয় দিক দিয়াই

২। এইরূপে সূর্য্য রশ্মি পাতায় আসিয়া পড়িতেছে।

৩। রূপান্তরিত হইবার জন্য কার্বন-দ্বি-অক্‌সাইড তন্তুকোষে প্রবেশ করিতেছে।

৪। পাতার স্বচ্ছ বহিরাবরণ।

৫। ক্লোরোফীল বা সবুজ-প্রাণপূর্ণ সবুজের বিশেষ কোষগুলি। এই সবুজ-প্রাণ সৌরতেজের সাহায্যে অজৈব উপাদানগুলিকে সবুজের খাদ্যে পরিণত করে।

৬; পাককার্য্যের শেষে অক্‌সিজেন মুক্তি পাইয়া সরিয়া পড়িতেছে।

৭, ৮ ও ৯। বায়ুচলাচলের জন্য ফাঁক।

১০। এই অংশে কোষগুলিতে অল্প আলোক আসায় খাদ্যও অল্প প্রস্তুত হয়।

১১। এই সূক্ষ্ম নালী-পথে জল পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হয়।

১২। এই ছাকুনি দিয়া প্রস্তুত খাদ্য বাহির হইয়া গাছের প্রতি অংশে রসপ্রবাহে নীত হয়।

বায়ুমণ্ডলে জীবের প্রাণপোষণোপযোগী উপাদান বাড়িতে থাকে। সবুজকে এই হিসাবে নীলকণ্ঠ বলা চলে। সবুজ কার্বন-দ্বি-অক্সাইডরূপী বিষ পান করিয়া বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভাগ বাড়াইয়া উহাকে প্রাণীর বাসপোযোগী করিয়া তুলে।

পাতার সকল অংশেই অতি সূক্ষ্ম নালীপথ আছে। এই নালীপথে রসাকারে খাদ্যের উপাদান আসিয়া পৌছিলে সৌরালোকের উত্তেজনায় ক্লোরোফিল উহাকে খাদ্যে পরিণত করে। ঐ খাদ্য তখন নালীপথেই আবার গাছের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

সবুজের প্রাণ ক্লোরোফিল পদার্থটি কি তাহা এখনও ধরিতে পারা যায় নাই। পাতা হইতে পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে উহাকে পাতা হইতে পৃথক করিতে না করিতে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দুইটি রঙ্গিন পদার্থে পরিণত হয়; একটির রঙ সোণালী পীত, অপরটি নীলাভ সবুজ। ক্লোরোফিল কিন্তু একটিমাত্র সবুজ রং, দুইটি রঙের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় নাই; ইহা এমনই অস্থায়ী যে আশ্রয়চ্যুত হইবামাত্রই দুইটি ভিন্ন উপাদানে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই কারণে এ পর্য্যন্ত সবুজের প্রাণস্বরূপ ক্লোরোফিলের প্রকৃতি অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গিয়াছে।

জীবজগতে যাহারই যে কোন কারণেই খাদ্যাভাব ঘটে বা যখন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেখানে প্রকৃতিদেবী নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীতকালে পোকামাকড়ের অভাব হওয়ায় যাহারা পোকামাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে উহারা ঐ সময় ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়। সরীসৃপ জাতির জীবনযাত্রা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্রীষ্মকালে যে দেশে জলাশয়ের জল শুকাইয়া যায় ঐ দেশে গ্রীষ্মাগমে পুকুরের পাঁকের মধ্যে মাছ আপন দেহ গুটাইয়া লইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করে। বর্ষাগমে আবার উহাদের ঘুম ভাঙ্গে এবং আপন অভ্যস্ত জীবলীলা আরম্ভ করিয়া দেয়।

রাত্রে সূর্য্যালোকের অভাবে সবুজের পাককার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, সেইজন্য বায়ুমণ্ডলে ও মাটিতে প্রচুর আহার থাকা সত্ত্বেও দেহের উপযুক্ত আহার উহা সংগ্রহ করিতে পারে না। এই সময় উদ্ভিদ নিদ্রিত হইয়া
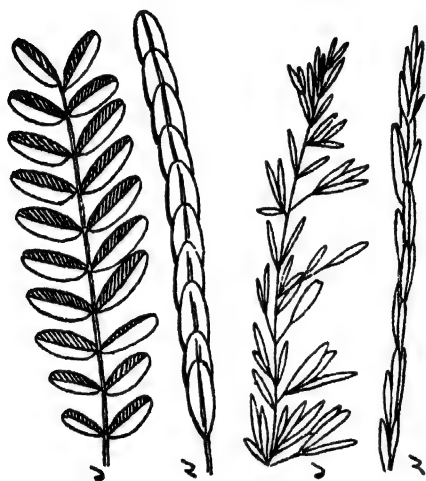
১। পত্রের জাগ্রত অবস্থা ২। নিদ্রিত অবস্থা

পড়ে বলিয়া খাদ্যের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। শীতপ্রধানদেশে শীতাগমে জল জমিয়া বরফে পরিণত হয় বলিয়া মাটিতে রসের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে, ফলে উদ্ভিদের পাককার্য্য চলিতে পারে না। এই কারণে উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটে। তখন সে আপন পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘ শীতনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

১২

সবুজের আহার্য্য সংগ্রহ

"এই সমুদায়ই জলে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে"—উপনিষদের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সৃষ্টিক্রিয়ায় বায়ুরও যেমন স্থান, জলেরও ঠিক সেইরূপ স্থান আছে। রস না হইলে এই বিশাল সৃষ্টি সম্ভব হইত না। মানুষের মতই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ আধারেই অবাধ প্রাণলীলার জন্য অবিরাম জলের যোগান প্রয়োজন। উদ্ভিদ জল সংগ্রহের জন্য এই কারণে পাতালেও আপনার মূল পাঠাইতে ভুল করে না।

উদ্ভিদের মূলের আমাদের মত দর্শনেন্দ্রিয় না থাকিলেও জলের অনুসরণে পাতালে প্রবেশ করিবার সময় পথ ভুল করে না। বৃষ্টিবিরল ভূখণ্ডে দেখা যায় দুই তিন ফিট উচ্চ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের মূল জলের খোঁজে ভূগর্ভে ৬০ ফুট পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহাদের অনুসন্ধান এমনই অব্যর্থ যে ঐ দেশবাসী চাষীরা পর্য্যন্ত জলের খোঁজে কূপ খনন করিবার সময় এইরূপ উদ্ভিদের মূলকে অনুসরণ করিয়া নিশ্চিতরূপে জলের স্তরে গিয়া উপস্থিত হয়।

উদ্ভিদের প্রতি অংশটি সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ইহার অধিকাংশই নিম্নলিখিত তেরটি পদার্থ-মূলে (elements) গঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ, অক্‌সিজেন, গন্ধক, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, কার্বন, সিলিকন, সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লৌহ। উদ্ভিদকে বাহির হইতেই এইগুলিকে সংগ্রহ করিতে হয়। সে আপন পাককক্ষে এইগুলি নানা উপায়ে সংগ্রহ করিয়া সৌরতেজে পাক করিয়া আপন গ্রহণোপযোগী করিয়া লয়।

উদ্ভিদ সাধারণতঃ চলিয়া ফিরিয়া এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারে না। যেস্থানে উহার জন্ম ঐস্থানেই উহাকে ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। উহার মাথার উপরে বায়ুমণ্ডল, নীচে মাটি। তাহা হইলে মাটি ও বায়ুমণ্ডল হইতেই সবুজকে ঐগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। সবুজ বেচারার আমাদের মত দাঁত নাই যে কঠিন খাদ্য চিবাইয়া লইবে, ফলে উহা রস ও বায়ুর আকার ব্যতীত অন্য কোন আকারে ঐগুলি গ্রহণ করিতে পারে না। বায়ুমণ্ডল হইতে বায়বীয় আকারেই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সে পায়; কিন্তু মাটি হইতে ঐগুলি গ্রহণ করিতে হইলে জলে গুলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

উদ্ভিদের পক্ষে জল অপরিহার্য্য। এই জলের অণু এবং আকাশ হইতে কার্বন-দ্বি-অক্সাইডের অণু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মুক্ত পরমাণুগুলিকে নূতনভাবে জট পাকাইয়া শ্বেতসার আদি প্রস্তুত করিয়া আপন দেহ রচনা করে।

সবুজের জীবনযাত্রায় মাটি হইতে খাদ্যরূপে সংগৃহীত উপাদানগুলির যে রূপান্তর ঘটে উহা রসাকারেই ঘটিয়া থাকে। ঐ উপাদানগুলি জলে গুলিয়া রসাকার গ্রহণ করে বলিয়াই এইরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব। সবুজের প্রতি অঙ্গের অধিকাংশই জল। সবুজের জীবলীলায় জল এতই প্রয়োজন যে উহার দেহের পঁচাত্তর হইতে পঁচানব্বই ভাগ পর্য্যন্ত জল ছাড়া আর কিছুই নহে, ফলে জলের অভাব হইলে উহার জীবলীলা চলিতেই পারে না।

এক কথায় রস সবুজের প্রধান অঙ্গ বলিলেই হয়। ইহার প্রতি কোষে রস ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করে। রস শুকাইয়া লইলে বায়ু আসিয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিতে পারে না। রস শুকাইয়া গেলে কোষগুলির সঙ্কোচন ঘটে, আবার রস পাইয়া পুনরায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া সজীব দেখায়। গাছের রসে সাধারণতঃ দানাল (crystalloids) উপাদানই থাকে, তবে আঠাল (colloids) উপাদানও পাওয়া যায়।

গাছের বাড় বা বাঁচার সহিত রসের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় রসকে মূল হইতে গাছের ডগা পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিতে হয়। রসই সবুজের প্রতি অংশে প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগান দিবার বাহন। আমাদের দেহ হইতে ঘর্ম্মাদিরূপে অবিরাম রস বাহির হইয়া যাইতেছে; আমাদিগকে ইহা পূরণ করিবার জন্য জল গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ সবুজের প্রতি অংশ হইতে, বিশেষতঃ প্রখর তেজে, অবিরাম রস বাষ্পাকারে আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। সেইজন্য দেহ গঠনের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশী জল উদ্ভিদের দরকার হয়।

যে পরিমাণ জল প্রতি সবুজটি ব্যবহার করে উহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মাঝারি আকারের পত্রেই প্রায় বিশলক্ষ ছিদ্র (stoma) থাকে, এই অসংখ্য ছিদ্র দিয়া অবিরাম জলকণা বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে। একটী গাছে যদি দুইলক্ষ পাতা থাকে তাহা হইলে ঐ গাছে ৪০০০০০০০০০০০ দ্বার দিয়া বাষ্পকণা অবিরাম বাহির হইয়া যাইলে কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। শতকোটি কৈশিক মূলকেই পাতালে নামিয়া এই পরিমাণ জল সংগ্রহ করিতে হয়।

দুইলক্ষ পাতায় সজ্জিত গাছের শীতপ্রধান দেশের অল্পায়ু গ্রীষ্মকালের একটা দিনেই প্রয়োজন হয় প্রায় দশমণ জল। ঐ দেশে শীতকালে যখন জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়, তখন পাছে জলের অভাবে উদ্ভিদকে উদ্ভিদলীলা সংবরণ করিতে হয়, সেইজন্য জলক্ষয়ের দ্বারগুলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গাছ পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করে। তখন জলের আয়ও নাই, ব্যয়ও নাই; অতএব ক্ষতির সম্ভাবনা কোথায়? গাছও আয় বুঝিয়া ব্যয় করে।

গাছের পাতার এইরূপ জল বিতরণের জন্য উদ্ভিদবহুল ভূখণ্ডের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হয় এবং ঐ স্থানে বাষ্প হইতে মেঘের অবিরাম পুষ্টি হওয়ায় বৃষ্টিরও অভাব হয় না। উদ্ভিদ সাক্ষাৎভাবে ও

পরোক্ষে প্রাণিজগতকে বহুপ্রকারেই সাহায্য করে। বৃষ্টি হইলে মূলে জল ধরিয়া রাখে, আবার পাতাল হইতেও জল সংগ্রহ করিয়া পত্রে পত্রে জলের কাজ সারিয়া আপন অসংখ্য ছিদ্রপথে বাষ্পকণাকে মুক্তি দিয়া পরোক্ষে মেঘসৃষ্টির সাহায্য করে এবং এইরূপে বর্ষণের সুবিধা করিয়া দিয়া শস্য উৎপাদনের অনুকূল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে।

১৩

উদ্ভিদের মধ্যে কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা

আমাদের উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশই বন্য অবস্থায় অসার ও অখাদ্য ছিল। বুনো বেগুন এমনই তিক্ত মুখে করা যায় না। পটল ও
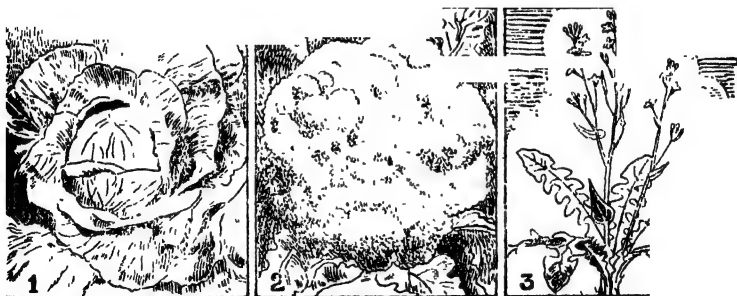
বাঁধাকপি ফুলকপি ১ ও ২ এর বন্য

শশাও তাই। আজকাল আলু যে এমন সুমিষ্ট খাদ্য, ইহাও একদিন বুনো অবস্থায় মানুষের অখাদ্য ছিল। শীতকালের বাঁধা ও ফুলকপি বন্য পূর্ব্বপুরুষ দেখিলে চেনাই যায় না উহার বংশধর আজ এই

রূপ ধরিয়াছে। রূপে, রংএ, স্বাদে, আকারে কোথাও পূর্ব্বপুরুষ ও বর্ত্তমান কপির মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া মানুষ আজ তাহার আহার্য্যের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে; অবশ্য প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই সে তাহার লক্ষ্যে পৌছিয়াছে। প্রকৃতি কতকগুলি বাঁধা পথে কাজ করে মাত্র; এইরূপ বাঁধাপথে কাজ করিতে করিতে সৃষ্টির কোন ধারায় যদি উন্নতি দেখা যায়, উহা নানা প্রাকৃতিক কারণের সমন্বয়ে একটা দৈবাৎ সংঘটন মাত্র, উহাতে প্রকৃতির কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। প্রাকৃতিক বাঁধা পথের সহিত মানুষের বুদ্ধির যোগ ঘটিলে প্রাকৃতিক সৃষ্টি মনোহর ও অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে।

মানুষ প্রাকৃতিক সৃষ্টির সংস্কার দুই প্রকারে করিয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলটি বাছিয়া লইয়া উহা দ্বারা উক্ত ধারার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। দ্বিতীয়তঃ একই জাতীয় নানা উদ্ভিদের সমন্বয়ে নূতন ধারা জন্মায়, ফলে এই বর্ণসংকর চারায় মূল-উদ্ভিদগুলির গুণগুলি বজায় থাকে এবং এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন উদ্ভিদ লাভ হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তাহা মানুষ বহুপূর্ব্বেই অনুভব করিতে পারিয়াছিল। মানুষ যখন তাহার বংশ বা সমাজের সংস্কার বা উন্নতি করিতে চায় তখন সে যে পন্থা অবলম্বন করে, উদ্ভিদের বেলাতেও উহা প্রযুজ্য। আমাদের সমাজে কৌলিন্য প্রথা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই প্রচলিত হইয়াছিল। বিদ্যা, স্বাস্থ্য, রূপ আদি গুণভূষিত ব্রাহ্মণপুত্র আনাইয়া বাছাই করা দেশীয় ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া যে সন্তান সন্ততি লাভ হইল উহারা হইল সমাজের উৎকৃষ্ট ধারা বা কুলীন শ্রেণী। এই উপায়ে তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

বাংলার নিকৃষ্ট গোবংশের উন্নতি সাধনের জন্য পশ্চিম হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ আমদানী করার খেয়াল বড়লাট লিংলিথগো সাহেবের হইয়াছিল। এই কৌশল ছাড়া বাংলার গোবংশের উন্নতি আর কোন উপায়ে হইবার নহে। উদ্ভিদের ধারাগুলির উন্নতিও এই পথেই করিতে হইবে। ভারতের ইক্ষু বংশের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি এই কৌশলেই সাধিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেশীয় বীজের উৎকৃষ্ট অংশ বাছাই করিয়া লইয়া প্রচুর সার যোগে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর এই ধারার সহিত সমজাতীয় বিদেশীয় ধারার মিলন ঘটাইয়া সম্পূর্ণ নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়া লইলে দেশীয় বীজের সংস্কার সাধন করা হইবে। বুনো পাহাড়ী টোকো কুল, মানুষের চেষ্টাতেই, সুস্বাদু মধুর কুলে পরিণত হইয়াছে। উদ্ভিদ-বংশের সংস্কারসাধনে আমেরিকার লুথার বার্বাঙ্কের মত আর কেহই পারেন নাই। তাঁহাকে উদ্ভিদ জগতের যাদুকর বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি যে কত রকমের নূতন ফলমূলের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এক গাছে দুই প্রকার ফল ফলান তাঁহার ছিল একটা সখ। বিলিতি বেগুনের (টম্যাটো) গাছে আলু ফলাইয়া তিনি জগৎকে চমকিত করিয়া দেন। কুলের আঁটি থাকিবে না—আঙ্গুরের বিচি থাকিবে না—এরূপ নানা অদ্ভুত উপাদেয় রসাল ফল তিনি ফলান। পুরাণে ঋষি বিশ্বামিত্রের সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা আছে বটে, কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের সাহায্যে লুথার বিশ্বামিত্রকে হার মানাইয়া ছাড়িয়াছেন।

টম্যাটো লতায় আলু গাছের কলম করিয়া যে নূতন উদ্ভিদধারা তিনি বহাইলেন, উহাতে উপরে জন্মিল টম্যাটো ও মূলে জন্মিল আলু। তিনি কেবল ভেল্কি দেখাইয়াই যান নাই—তিনি নানা ফল, শস্য, ফুল আদি সবুজের বংশধরের এমন উন্নতি সাধন করিয়াছেন যে পূর্ব্বে যেখানে

উদ্ভিদে এক গুণ ফল পাওয়া যাইত, বর্ত্তমানে সেখানে দশগুণ ফল পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে মানুষে উদ্ভিদের কোন ধারার উন্নতি করিবার জন্য প্রতিবারই বীজ বাছাই করিয়া লইত। ইহাতে অতিশয় ধীরে ধীরে উক্ত উদ্ভিদের বংশধারার উন্নতি হইত। ক্রমাগত বীজ বাছাইয়ের ফলে কালে উহার এক উন্নত সংস্করণ জন্মগ্রহণ করিত। আজকাল বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ ইচ্ছামত যে কোন উদ্ভিদ বংশধারার উন্নতিসাধন অল্প সময়ের মধ্যেই করিতে পারে।

মানুষের বেলাতেও যে নিয়ম খাটে, প্রাণীজগতেও সেই নিয়মেই একই ফল পাওয়া যায় এবং উদ্ভিদ জগতেও উহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অষ্ট্রিয়াবাসী মেণ্ডেল সাহেব প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বর্ণসংকর উৎপাদন করিবার সময় এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। যে নিয়মের বশে প্রাণী-জগতে বর্ণসংকর সন্তানগুলির মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্টগুলি ফুটিয়া উঠে; ঠিক অনুরূপ নিয়মের বশেই উদ্ভিদ জগতেও নূতন বীজে পিতামাতার বৈশিষ্ট ফুটিতে দেখা যায। মনোমত পুং-বৃক্ষ হইতে পুষ্পের রেণু সংগ্রহ করিয়া স্বজাতীয় স্ত্রী-বৃক্ষের পুষ্পে অতি মিহি তুলির সাহায্যে মাখাইয়া দিলে স্ত্রী-বৃক্ষ যে ফল ধারণ করে উহাতে পিতামাতা উভয়েরই বৈশিষ্ট ফুটিতে দেখা যায়। এইরূপ উপায়ে মানুষ আজ ইচ্ছামত নূতন নূতন শস্য ফল, লতা, পুষ্প আদি সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিজাত উদ্ভিদধারার অভূত-পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে।

মানুষের দেশগত, জাতিগত বা ধর্ম্মগত সংস্কার ও অভিমান নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করায় মানুষের বেলায় বৈজ্ঞানিক ঠিক ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে পারেন না। প্রাণীজগতে ঠিক অনুরূপ সংস্কারের বালাই না থাকায় বৈজ্ঞানিক ইচ্ছামত কোন কোন বংশধারার উন্নতি বহুলাংশে করিতে পারিয়াছেন। তথাপি প্রাণীর বেলাতেও মানুষ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা পায় না। দেশগত ও জাতিগত অভ্যস্ত জীবন একই জাতীয় বিভিন্ন দেশের তুইটি স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বাধা উপস্থিত করে, ফলে অবাধ স্বাধীনতার অভাবে জীবজন্তুর উন্নতি মানুষ তত তাড়াতাড়ি করিতে পারে নাই। কিন্তু যে পরীক্ষা জঙ্গম আধারের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই, স্থাবর আধার উদ্ভিদের পক্ষে উহা সম্ভব হওয়ায় মানুষ উদ্ভিদ বংশধারাগুলির কোন কোন শাখায় এমন পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন যে পূর্ব্বপুরুষ ও বর্ত্তমান বংশধারায় কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

১৪

সবুজের বুঝের পরিচয়
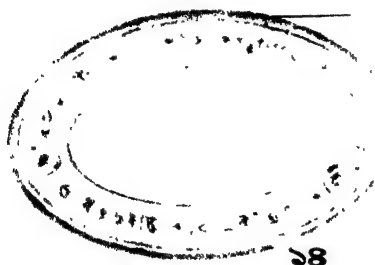
বিখ্যাত জর্ম্মণ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ আণ্টন্ ফার্ণারের বদ্ধমূল ধারণা যে সবুজের বেশ জ্ঞান আছে, সে একেবারেই অজ্ঞান জীব নহে। কোন প্রাণবন্ত আধার যদি সম্পূর্ণ না বুঝিয়াই একটা এমন কাজ করে যাহাতে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা হইলে কি মনে হয়? একটা কাজ একবারই করিলে একটা দৈবাৎ সংঘটন বলিয়া বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু একই কাজ একই উদ্দেশ্যে ক্রমাগতই কাহাকেও যদি করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে কি মনে হয় না যে উক্ত আধার হয় বুঝিয়া করিতেছে না হয় পুরাতন অভ্যাস বশতঃ অন্ধের মত করিতেছে। অভ্যাস কি বংশ-পরম্পরায় চালিত হয় না? অভ্যাসের মূলে কি অভিজ্ঞতা বা বুঝের পরিচয় পাওয়া যায় না?

সকল অভ্যাসই কি বংশপরম্পরায় বহিয়া চলে? তাহা হইলে বীরের পুত্র কাপুরুষ হয় কেন? সংযমীর পুত্র অসাধু হয় কেন? সবুজের আত্মরক্ষার অভ্যাস বংশপরম্পরায় বহিয়া চলিতে পারে, কিন্তু নূতন বংশধরের পক্ষে লুকাইবার স্থানের এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে যে জ্ঞান না থাকিলে সে লুকাইতে গিয়া দেখাইয়া ফেলিবে; ইহাতে বীজ রক্ষা সম্ভব হইবে না। দেখা গিয়াছে পাথরের ফাটালে গাছ জন্মিল, ঐ গাছ আপন বীজ রাখিবার জন্য পাথরের আড়াল ব্যবহার না করিয়া পাথরের ফাটাল ব্যবহার করে কেন? এইরূপ বাছাবাছি সে করে কেমন করিয়া? একেবারে অজ্ঞান জীবাধার পূর্ব্বপুরুষের অভ্যাস জন্মের সহিত লাভ করিয়া কাজ করিতে পারে; কিন্তু ঐরূপ কার্য্যে বাছাবাছির প্রয়োজন হইলে সে করে কেমন করিয়া?

উদ্ভিদের গর্ভাধানে পরাগকণা গর্ভমুণ্ডের উপরে কোন বাহনের কাঁধে চাপিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া কেমন করিয়া জানিতে পারে যে ঠিক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর গর্ভদণ্ড ভেদ করিয়া নামিয়া আসিয়া কেমন করিয়া একটিমাত্র ডিম্বাণুর সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া ফল উৎপন্ন করে। এইরূপ একটা জটিল ব্যবস্থায় সকল অংশই কি দৈবাৎ সংঘটনের ফলে ঘটিয়া থাকে, না চৈতন্য সকল আধারেই প্রয়োজনানুযায়ী আত্মবিকাশ করেন?

যে জলজ উদ্ভিদে জলের মধ্যে বাড়িবার সময় পাতার কোন সাধারণ ক্ষুদ্র দ্বার (stomate) দেখা দেয় না, বায়ু চলাচলের বৃহৎ পথের বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ উদ্ভিদের পাতাই জলের উপর উঠিলে উহাতে বায়ু চলাচলের পথ হয় স্বল্পপরিসর এবং বহু সংখ্যক দ্বার বিকশিত হইতে দেখা যায়। সকল অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা কি প্রত্যেক বারই দৈবাৎ সংঘটন বলিয়া ধরিব, না সবুজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার শক্তির পরিচয়রূপে ধরিব?

দরকার হইলে সূর্য্যের আলোর জন্য সূর্য্যের দিকে গাছের আপন পাতা বিস্তার করিয়া ধরা, পরাগযোগে ডিম্বাণু বীজে পরিণত হইয়া পক্ক হইলে ঐ শাখা বাঁকিয়া বীজগুলিকে জীবজন্তুর কবল হইতে বাঁচিয়া নিশ্চিন্তে চারাইবার অবকাশ দিবার জন্য পাথরের ফাটালের মধ্যে ফেলিয়া
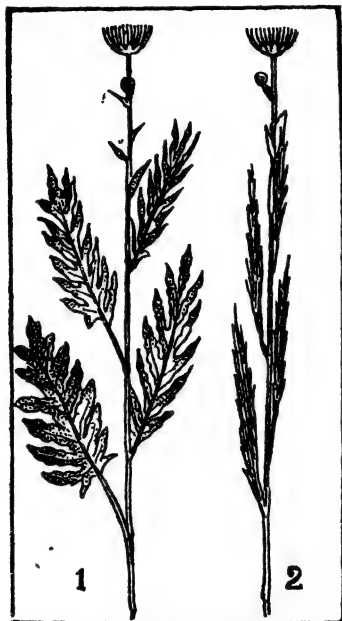
এই গুল্মটির নাম সিলফিয়াম, উত্তর আমেরিকায় জন্মে। ইহার পাতাগুলি সদাসর্ব্বদা পূর্ব্ব-পশ্চিম মুখী হইয়া থাকে। ১। পাতা উত্তর-দক্ষিণ হইতে যেরূপ দেখায়, ২। ঐ পূর্ব্ব-পশ্চিমে যেরূপ দেখায়।

দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য কি দৈবাৎ সংঘটন বলিয়া ধরিতে হইবে ? সবুজ যে নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করে, সর্ব্বক্ষেত্রেই উহা যোগাযোগের একটা দৈবাৎ সংঘটন বলিয়া ধরিলে স্বষ্টির সকল কার্য্যই দৈবাৎ সংঘটনে পর্য্যবসিত হইবে, কোথাও চৈতন্যময় সত্বার অস্তিত্ব থাকিবে না।

আক্রান্তের আত্মরক্ষা

আক্রান্ত হইলে জল বিছুটির মত চারার ভঙ্গুর কেশগুলি ফুটাইয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপায় দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জলবিছুটির পাতার গায়ে আমাদের গায়ের লোমের মত রোঁয়া জন্মায়। এই রোঁয়াগুলি বড়ই ভঙ্গুর, কিছুতে ঠেকিবামাত্র উহার ডগা ভাঙ্গিয়া যায়। এই সরু নলের মত মুখগুলি ধারাল হওয়ায় গায়ে লাগিবামাত্র চামড়ায়
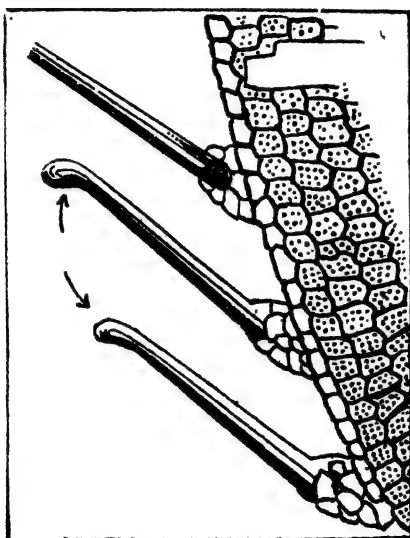
জল বিছুটি গাছের পাতার কেশের অতিবর্দ্ধিত রূপ।

গাথিয়া বসে। তাহার উপর কেশগুলি ফাঁপা হওয়ায় উহা দিয়া এক প্রকার জ্বালাকর রস উদ্ভিদের অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আহত স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিষাক্ত রস আহত স্থানে লাগিবামাত্র জ্বলিতে আরম্ভ করে এবং আহত স্থান ফুলিয়া উঠে। এই রস কিন্তু অনাহত স্থানে লাগিলে মোটেই জ্বলে না। আক্রান্ত হইলে এইরূপে নিঃশব্দে আঘাত করিয়া অসহায় চারা আপনাকে বহুস্থলেই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করে।

কীটভুক উদ্ভিদ

কোন কোন উদ্ভিদ মধুচোরকে আপন ফাঁদে ধরিয়া মারিয়া ফেলে এবং উহার রস নিঃশেষে পান করিয়া আপন দেহ রচনায় লাগায়। এইরূপ একটি উদ্ভিদ আমাদের দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পাতাগুলি দেখিতে ঠিক হাতার মত; অতএব ইহাকে হাতাপাতা উদ্ভিদ বলিলে মন্দ হয় না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ড্রসিরা বারমেনাই (Drosera Burmanii)। শীতের শেষে আমাদের দেশের বর্দ্ধমান অঞ্চলের শক্তিগড় আদি স্থানে ধান কাটার পর ধেনো জমিতে মাঝে মাঝে এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের গিরিডি ও পরেশনাথের মধ্যবর্ত্তী পথের দুই ধারে ইহা প্রচুর জন্মে।

ইহার হাতার মত লাল পাতার গোছা মাটিতে শুইয়া থাকিতে দেখা যায়। সবুজ আসনের উপর টক্‌টকে লালের ছিটের মত দূর হইতে বেশ ভালই দেখায়। এই তৃণের পাতার উপরপিঠ সরল ও খাড়া দীর্ঘকেশে পরিপূর্ণ। কেশগুলির গঠন অনেকটা আলপিনের মত। এই কেশের গোলাকার ডগা একটি গ্রন্থিবিশেষ। এই গ্রন্থি হইতে একপ্রকার আঠাল অম্লরস বাহির হইয়া পাতার উপরে ছড়াইয়া পড়িয়া সূর্য্যকিরণে চক্‌চক্ করে। কীটপতঙ্গ পাতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উহার মধু পান করিবার আশায় উহার উপর বসিবামাত্র পাতার আঠাল রসে জড়াইয়া পড়ায় আর পলাইয়া যাইতে পারে না।

এইরূপে ধৃত পতঙ্গ যতই পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে, ততই কেশগুলির উপর টান পড়ে। তখন ফাঁদে শিকার পড়িয়াছে অনুমান করিয়া ক্রমশঃ সকল কেশগুলিই চতুর্দ্দিক হইতে বাঁকিয়া আসিয়া পতঙ্গটির উপর পড়িয়া উহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলে। তাহার পর কেশগুলি হইতে ক্ষরিত সমবেত রসে পতঙ্গটি প্রায় ডুবিয়া ছটফট করিতে করিতে মারা পড়ে। ঐ রসে পাচক রস থাকায়, যে পতঙ্গ হাতাপাতার
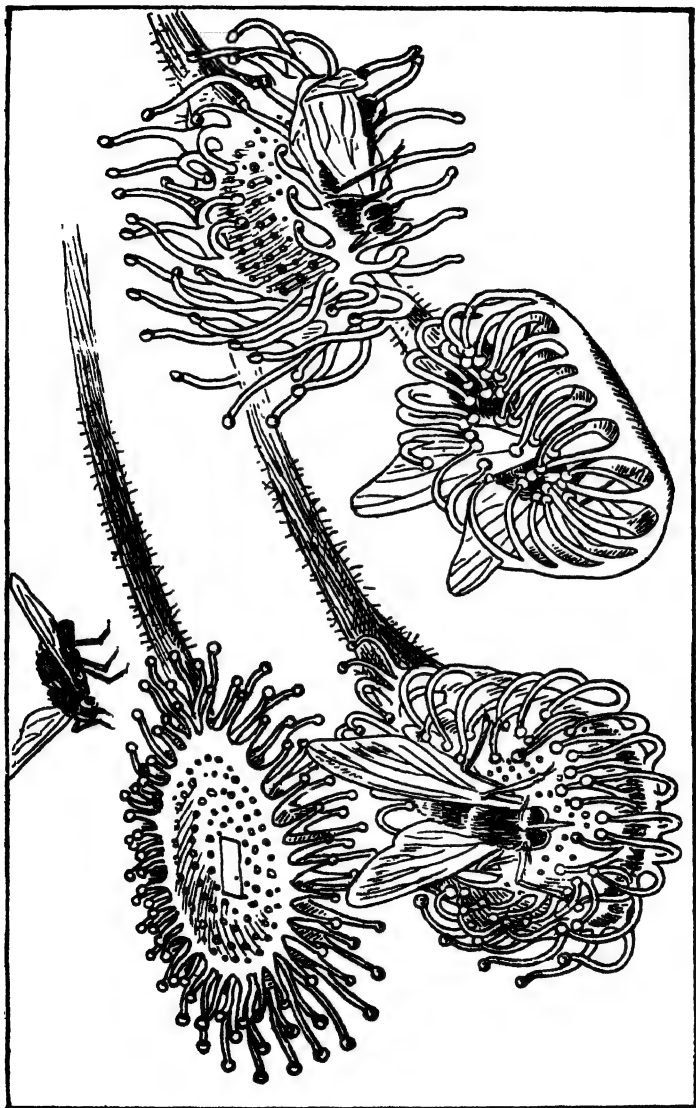
রস পান করিবার আশায় আসে, উহারই রস হাতাপাতা পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে।

জীবজন্তুর পাকাশয়ে যেমন ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হয়, ঠিক সেইরূপই গুটান পাতা যেন সাময়িকভাবে পাকস্থলীতে পরিণত হইয়া উক্ত ধৃত পতঙ্গকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। তাহার পর হাতাপাতার গুটান পাতা আবার ছড়াইয়া পড়ে এবং পতঙ্গদেহের যে দুষ্পাচ্য অংশ উহাতে পড়িয়া থাকে, উহা মলরূপে পাতা হইতে খসিয়া পড়ে। অনেক সময় পতঙ্গের ডানা পাতার উপরে লাগিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মধুচোরধরা ফাঁদ

ইয়োরোপে টিজ্‌ল্ জাতীয় উদ্ভিদে পোকা মাকড় হইতে বাঁচিবার এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছ উচ্চে দুই তিন হাত পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা যায়। ইহার কাণ্ড ও পাতাগুলির উল্টাপিঠ কণ্টকময়। ইহার ফুলগুলির আকার ও রূপ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফুলগুলি আকারে মোচার মত এবং নানা রংএর বীজ প্রসব করে।

কাণ্ডর স্থানে স্থানে জোড়ায় জোড়ায় পাতা বাহির হয়। এই পাতা দুইটির নিম্নাংশ গুটাইয়া ছোট ভাঁড়ের মত আকার গ্রহণ করে। কাণ্ডের গাঁটে গাঁটে এইরূপ পাতার ভাঁড় গড়িয়া উঠে। রাত্রের শিশিরকণা ও বৃষ্টির জল ঐ ভাঁড়গুলিতে সঞ্চিত হয় বলিয়া পিপীলিকা প্রভৃতি কীটেরা মাটি হইতে গাছে উঠিয়াও ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি পার হইয়া ফুল পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না। উহারা ফুলের মধু চুরি করিবার চেষ্টায় গাছের উপরে উঠিতে গিয়া জলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। এই মধু পতঙ্গের জন্য সঞ্চিত থাকে; উহারা মধুর লোভেই পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া

পরাগযোগে সাহায্য করিলে ঐ গাছের বংশধারা বজায় থাকে। পিপীলিকাদি কীটের মধু চুরি বন্ধ না করিতে পারিলে আপন বংশলোপ
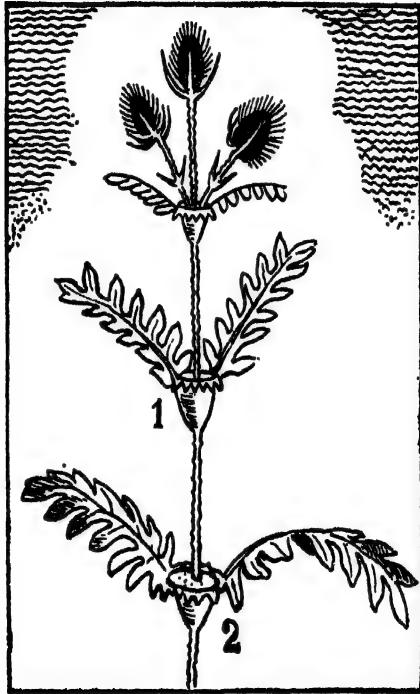
১ ও ২। মধুচোর ধরা ফাঁদ।

হইবার আশঙ্কা থাকে, সেইজন্য এই জাতীয় উদ্ভিদ মধুচোর ধরিবার এই জলের ফাঁদ পাতিয়া রাখে।

১৫

কয়েকটি গাছের কথা

(ক) ত্বকসার তিসি গাছ

পাট, শণ আদি ত্বকসার গাছগুলির মধ্যে তিসি একটি। শিল্পজগতে ইহার স্থান অতি উচ্চে। ত্বকের অপেক্ষা তৈলের জন্যই আজ জগতে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। তবে আমাদের দেশে কার্পাসের যে স্থান, ইয়োরোপে একদিন তিসির ঐ স্থান ছিল। আমাদের দেশের পাটের মত তিসি গাছের আঁশ ছাড়াইয়া ঐ আঁশ হইতে সূতা পাকাইয়া মিহি কাপড় বোনা হইত। এই কাপড় লিনেন (Linen) নামে পরিচিত। কার্পাসের চাষ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য বলিয়া সুলভ, ফলে দিন দিন কাপড়ের জন্য তিসির চাষ কমিয়া আসিতেছে। তবে ইহার প্রস্তুত কাপড় এত চমৎকার যে অধিক মূল্যেও ইহা বিক্রয় হয় বলিয়া আয়র্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু স্থানে আজিও ইহার চাষ হয়। রাশিয়ায় কাপড় ও তৈল উভয়ের জন্যই ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। আমেরিকায় আমাদের দেশের মতই ইহার চাষ প্রধানতঃ তৈলবীজের জন্যই লোকে করিয়া থাকে।

তিসিত্বকের আঁশ প্রায় ফুটখানেক দীর্ঘ এবং এত দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ আঁশ অপেক্ষা দৃঢ়। তিসির সূতা হইতে প্রস্তুত বস্ত্র প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম আদি সাম্রাজ্যে একটা বিলাসের উপকরণ ছিল। শুভ্রতায় দুগ্ধের মত, চাকচিক্যে রেশমের মত এবং স্পর্শে এমনই কোমল যে কার্পাসের তুলনায় মূল্যবান হইলেও ইহার চাহিদা আজিও কমে নাই। ডাবলিন হইতে আমদানী যে রুমালগুলি আমাদের বাজারে সাদরে বিক্রীত হয়, উহা ঐরূপ লিনেন হইতে প্রস্তুত। আজকাল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কার্পাসের চাষ ও সংগ্রহ যন্ত্র সাহায্যে হয়

বলিয়া উহা এত সুলভ ; কিন্তু তিসির চাষ ও উহার আঁশ সংগ্রহ এখনও হাতেই করিতে হয় বলিয়া উহা এত মহার্ঘ।

তিসির গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ পর্য্যন্ত বাড়ে এবং কয়েকটি ছোট ছোট শাখা ছাড়ে। ইহার সরু সরু পাতাগুলি শাখায় একটি অপরটির
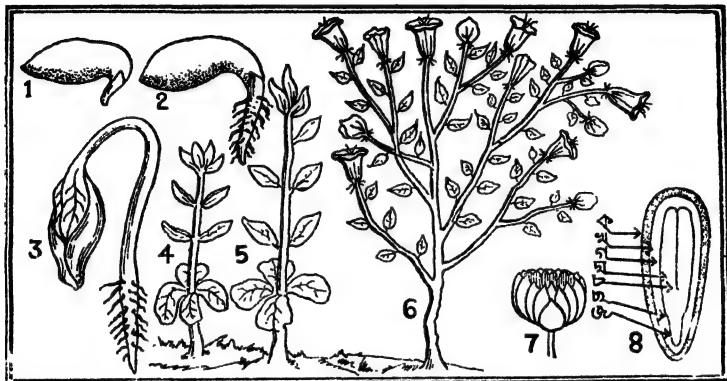
১। বীজ চারাইতেছে, ২। মূল দীর্ঘাকার হইয়া মাটিতে প্রবেশ করিতেছে, ৩। বীজ-পত্র বিকশিত হইতেছে, ৪ ও ৫। চারা গাছ বড় হইতেছে, ৬। গাছে ফুল ধরিয়াছে, ৭। বীজকোষ, ৮। বীজের পরিচয় :—

(ক) উপরের খোসা, (খ) ভ্রূণের আহার, (গ) ভ্রূণ, (ঘ) বীজ-পত্র, (ঙ) বীজ-মুকুল, (ছ) বীজ-কাণ্ড, (জ) বীজ-মূল।

বিপরীত দিকে জন্মে। কালে অসংখ্য ফিকে নীল রংএর ফুল ধরে এবং এইগুলি পরে পাঁচকুঠরী কোষে পরিণত হয়। এই বীজকোষের প্রত্যেক কুঠরীতে দুইটি করিয়া ক্ষুদ্র বীজ জন্মে।

তিসি চাষের জন্য ভাল সারাল দোঁয়াশ (loam) মাটি দরকার এবং জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইহার বীজ আমাদের দেশের পাট বীজের মত হাতে ছড়াইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বোনা হয়। গাছ একটু বড় হইলে হাতে করিয়াই নিড়াইয়া দিতে হয়। আঁশের জন্য চাষ করা

হইলে বীজকোষগুলি পাকিবার পূর্ব্বেই গাছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া এক স্থানে জড় করা হয়। পাতাগুলি শুকাইয়া গেলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পচাইবার জন্য জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়। পনর দিনে উহার গায়ের ছাল পচিয়া উঠিয়া কাঠি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার আঁশ পাটের মত স্থূল ও দীর্ঘ হয় না বলিয়া পাটের মত জলে কাচিতে গেলে জোট পাকাইয়া যায়। সেইজন্য ঐদেশে জল হইতে তিসির গাছগুলি তুলিয়া লইয়া পুনরায় শুকাইয়া লইয়া মুগুরের আঘাতে কাঠিগুলেকে টুকরা টুকরা করিয়া আঁশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর উহা লোহার চিরুণীতে আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া গাঁট বাঁধা হয়। জলে পচিলে পাট পচানি জলের মতই একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়।

তৈলের জন্য চাষ করিলে, বীজকোষগুলি পাকিতে দেওয়া হয়। বীজকোষগুলি পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে কাঠিগুলিও হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। আমেরিকায় তৈল ও খোলের জন্য প্রধানতঃ চাষ হয় বলিয়া যন্ত্র সাহায্যে তিসি কাটিয়া তোলা হয়। তাহার পর সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে বীজ-কোষগুলি আঁচড়া সাহায্যে ঝাড়িয়া পৃথক করা হয়। পরে এই বীজ-কোষগুলি হইতে বীজ বাহির করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া কলে পিষিয়া তেল বাহির করা হয়। তেল বাদে খোল ঘানিতে পড়িয়া থাকে, এই খোল গো-মহিষাদির ও ক্ষেতের অতি উত্তম খাদ্য।

(খ) মধুস্রাবী খেজুর গাছ

মানুষের খাদ্যের যোগানদার হিসাবে খেজুর গাছের আসন সর্ব্বোপরি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, যেখানে নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মিবার মত অনুকূল আবহাওয়া বর্ত্তমান, সেখানে মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া খুব বেশী কঠিন কাজ নহে; কিন্তু

যেখানে বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতে উপিয়া যায়, যেখানে এক টুকরা তৃণ জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত সুযোগ পায় না, এমন প্রতিকূল যোগাযোগেও কোন উদ্ভিদ যদি মানুষের প্রচুর আহার যোগাইতে পারে, তাহার স্থান উদ্ভিদ জগতে যে সর্ব্বোপরি হইবে সে বিষয়ে দ্বিমত হইবার অবকাশ কোথায় ?

ইহা মরুভূমির মত শুষ্ক ও উষ্ণ ভূখণ্ডে জন্মিয়া পাতাল হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনে এবং বাতাস ও মাটি হইতে অন্যান্য উপাদান যোগাড় করিয়া আপন অঙ্গ রচনা করে। ইহা মানুষের সেবার বিশেষ অপেক্ষা রাখে না ; অথচ মানুষকে প্রচুর আহার্য্য দান করে। জন্ম হইতে সাত বৎসরের পর হইতেই ইহা ফলপ্রসূ হয় এবং দুইশত বৎসর ধরিয়া ফল দিয়াও ক্লান্তি বোধ করে না।

মরুভূমিতে যে গাছ জন্মে উহার কাণ্ড প্রায় ৬০ হাত উচ্চ হইতেও দেখা গিয়াছে। এত উচ্চে ৮ হাত দীর্ঘ পাতাগুলি শীর্ষদেশে ঝুঁটির মত দেখায়। দূর হইতে পাতাগুলিকে ঠিক পাখীর পালকের মত দেখিতে হয়। ছায়াহীন মরুপ্রান্তরে ক্লান্ত খররৌদ্রপীড়িত মানুষ যখন ইহার ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি জুড়ায়, তখন তাহার হৃদয় গাছের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠা আশ্চর্য্য নহে।

মরুভূমিবাসীর নিকটে আমাদের দেশের নারিকেল গাছের মত খেজুর গাছের প্রতি অংশটির বিশেষ মূল্য আছে। ফল মানুষের আহার যোগায় এবং ফলের ডাঁটাগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে উটের খাদ্যে পরিণত হয়। গাছের রস মানুষের তৃষ্ণা মিটায়, আমাদের দেশে ঐ রস জ্বাল দিয়া উপাদেয় খেজুর গুড় প্রস্তুত হয়। ঐ রস দম্বল দিয়া গাঁজাইলে এক প্রকার সুলভ মদ্যে পরিণত হয়। আমাদের দেশে ইহা তাড়ি বলিয়া পরিচিত। বাঁশের কোঁড়ার মত খেজুর গাছেরও কোঁড়া জন্মে। এই কোঁড়া অবিকশিত পত্রগুচ্ছ বই আর কিছুই নহে। মরুবাসী ইহাকে

তরকারির মত রাঁধিয়া খায়। খেজুর পাতায় চাটাই, ঝুড়ি, থলি এমন কি গরীব লোকের টুপী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। আরব দেশে পাতার আঁশ হইতে দড়ি পাকান হয়। কাণ্ডের কাষ্ঠ হিসাবে কোন মূল্য না থাকিলেও খুঁটির মত ব্যবহার করা চলে। এই কাণ্ডের অন্তর্দ্দেশের নরম ক্বাথ হইতে সাগুর মত এক প্রকার শ্বেতসারবহুল আহার্য্য প্রস্তুত হয়। এত গুণ যাহার, তাহার যে মরুবাসীর মধ্যে বিশেষ আদর হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। খেজুর গাছ ব্যতীত উত্তর আফ্রিকা, আরব ও ইরাণবাসীদিগের কি দুর্দ্দশা হইত তাহার ঠিকানা নাই।

ইহাকে আমেরিকায় জন্মাইবার চেষ্টা হয়। ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশ ইহার জন্মের অনুকূল বলিয়া মনে হওয়ায় স্পেনবাসী পাদ্রীরা প্রথমে স্পেন হইতে খেজুর বীজ আনিয়া বপন করেন। এই বীজগুলি হইতে যে গাছগুলি জন্মিল, উহারা বৃষ্টিহীন উদ্ভিদবিরল মরুপ্রান্তরে একটা নয়নানন্দকর বৈচিত্র আনিল বটে, কিন্তু অল্প গাছেই ফল ধরায় মানুষের ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না। অধিকাংশই বাঁড়া গাছ জন্মিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা মরুভূমির মত ফলপ্রদ খেজুর গাছ জন্মাইবার আর একবার চেষ্টা করিল। এবারে উহারা স্পেন হইতে বীজ না আনাইয়া ইরাণ হইতে বীজ আনাইয়া বপন করিলেন। গাছ জন্মিল, বড় হইল, কিন্তু ফলের বেলায় দেখা গেল মাত্র কতকগুলিতে ফল ধরিয়াছে, বাকিগুলি বাঁড়া গাছ। এবারেও মানুষকে প্রকৃতির নিকট হার মানিতে হইল। বার বার এই বিফলতায় মানুষের জিদ বাড়িয়া গেল, উহারা এই বিফলতার কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

যে দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেজুর গাছ জন্মে, সেই দেশের লোকেরা বীজ হইতে খেজুর চারা না করিয়া, উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ খেজুর গাছের মূলে উদ্গাত তেউড় তুলিয়া লইয়া পুঁতিয়া খেজুর গাছ জন্মায়। তাহারা বহু

যুগের অভিজ্ঞতায় জানিতে পারে যে বীজ হইতে যে গাছ জন্মিবে উহা যে ফলপ্রদ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ফলপ্রদ গাছের তেউড় পুঁতিয়া গাছ জন্মাইলে উহা হইতে ফলপ্রসূ খেজুরগাছ নিশ্চয়ই জন্মিবে। ইহার কারণ তাহারা জানিত না বটে, ফলপ্রদ গাছ জন্মাইবার উপায় কিন্তু তাহারা জানিত।

মরুভূমিতে জলের বড়ই অভাব, অথচ গাছের প্রচুর জলের দরকার আছে। গাছ যদি মানুষের ক্ষুধা না মিটাইতে পারে তাহা হইলে নয়নানন্দকর হইয়া বাঁচিয়া মরুভূমির মূল্যবান জল অপচয় করিবার তাহার অধিকার নাই। গাছ ফলপ্রসূ হইবে কি না তাহা সাত বৎসরের পূর্ব্বে জানিতে পারা যায় না, সেইজন্য বীজ হইতে গাছ পুঁতিয়া একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে বহুদিন ধরিয়া থাকিতে হয়।

খেজুর গাছ একলিঙ্গ উদ্ভিদ। ফলে কোন বীজ হইতে পুং-উদ্ভিদ জন্মে, আবার কোন বীজ হইতে স্ত্রী-উদ্ভিদ জন্মে। স্ত্রী-উদ্ভিদের ডিম্বাণুর সহিত পুং-উদ্ভিদের পরাগযোগ না ঘটিলে গাছে ফল ধরিবেই না। কোন স্থানে কেবলমাত্র স্ত্রী-উদ্ভিদ থাকিলেও ঐগুলি বন্ধ্যা উদ্ভিদে পরিণত হইবে। প্রকৃতি কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে চান না, তিনি বহুবার ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, বীজগুলি চারাইলে প্রায় অর্দ্ধেক পুং ও অর্দ্ধেক স্ত্রী-উদ্ভিদ জন্মে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য বংশধারা বজায় রাখা, এই উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সফল হয়।

ক্ষুধিত মানুষের উদ্দেশ্য হইল স্বল্পবারি মরুভূমিতে অল্প জল ব্যয় করিয়া প্রচুর ফল পাওয়া। মানুষ সবুজের মধ্যেও প্রাণীর মত মৈথুনী সৃষ্টির রহস্য জানিতে পারিয়া বহু স্ত্রী-খেজুর গাছের মধ্যে একটি মাত্র পুং-খেজুর গাছ রাখিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে স্ত্রী-উদ্ভিদের ডিম্বাণুর জন্য পরাগযোগের অভাবও হইল না, অথচ বহু রাঁড়া গাছের স্থলে ফলপ্রসূ স্ত্রী-উদ্ভিদ জন্মাইতে পারা গেল।

খেজুর গাছের প্রকৃতি আমাদের দেশের ধান গাছের মত অনেকটা। ধানগাছের কাণ্ডের অধিকাংশ জলে ডুবিয়া থাকিবে এবং মাথার উপর তীব্র রৌদ্র পাইবে, তবেই ধান প্রচুর হইবে। খেজুর গাছের প্রকৃতি অনেকাংশে এইরূপই বটে। এই গাছ ঠিক মরুভূমিতে জন্মে না, জন্মে মরূদ্যানে (oasis)। সেখানে মূলে পায় প্রচুর ভূগর্ভস্থ জল এবং মাথার উপরে পায় প্রচুর সৌরতেজ। ইহার বাড়ের জন্য বায়ুমণ্ডল হওয়া চাই একেবারে শুষ্ক, বাষ্পবহুল বায়ুমণ্ডলে ইহা তেমন বাড়ে না।

প্রকৃতির কোলে মানুষ হইলে বায়ুর সাহায্যে প্রকৃতি স্ত্রী-উদ্ভিদের ডিম্বাণুতে পরাগসংযোগ করিয়া থাকে। খেজুর গাছের স্ত্রী-অঙ্গ পবনানুরাগী হওয়ায় বহু রাঁড়া গাছের ব্যবস্থা না থাকিলে অন্ধ বায়ু ভুল করিলে উদ্ভিদের বংশধারা বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিবে, সেইজন্য প্রকৃতি দেবী প্রয়োজনের অপেক্ষাও অনেক বেশী রাঁড়া গাছ জন্মান। সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করিতে হইলে প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন।

মরুবাসীরা বহুপূর্ব্বেই উদ্ভিদজগতে মৈথুনী সৃষ্টির রহস্য ধরিতে পারায়, তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাঁড়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিত। পরাগ-যোগের ভার অন্ধ বায়ুর উপর না দিয়া মানুষ নিজে লওয়ায় সম্ভাবনা নিশ্চয়তায় পরিণত হইল। তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাঁড়া গাছ রাখিয়া প্রয়োজন কি ? একশতটি স্ত্রী-উদ্ভিদের মাঝে একটি রাঁড়া গাছ রাখিলেই সকলকেই পরাগ যোগানর পক্ষে যথেষ্ট।

তখন আরববাসীগণ পুং-উদ্ভিদ হইতে পরাগ উৎপাদক ফুলের গুচ্ছ কাটিয়া লইয়া, স্ত্রী-গাছের ফুলের মাঝে খেজুর পাতায় বাঁধিয়া দিতে লাগিল। বায়ুভরে দুলিবার সময় এই শাখা হইতে পরাগকণা ঝরিয়া স্ত্রী-পুষ্পে পড়ায় ডিম্বাণুগুলি সুস্বাদু ফলে পরিণত হয়। এইরূপে একটিমাত্র রাঁড়া গাছের সাহায্যে বহু স্ত্রী-উদ্ভিদের গর্ভসঞ্চার করা সম্ভব হওয়ায় বহু রাঁড়া গাছ রাখিয়া জলের অপচয়ের প্রয়োজন রহিল না।

র্ঁাড়াগাছ হইতে পরাগগ্রহ পুষ্পশাখা কাটিয়া আনিয়া ফলগ্রহ পুষ্পশাখায় একটি থলির মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই জাতীয় স্ত্রী-উদ্ভিদের গর্ভ-সঞ্চারের আরও সহজ উপায় আবিষ্কার করিল। এক গুচ্ছ পরাগপ্রসূ পুষ্প ফলপ্রসূ পুষ্পের মাঝে না ঝুলাইয়া ফলপ্রসূ পুষ্পের আবরণ খুলিয়া উহার মধ্যে একটিমাত্র পরাগপ্রসূ পুষ্পের বোঁটা বাঁধিয়া দিলে, বায়ুভরে উহা দুলিয়া দুলিয়া পুষ্পের প্রতি ডিম্বাণুটিতে পরাগ সংযোগ করিতে পারে। এখন আরববাসীগণ এইরূপ উপায়েই খেজুরের চাষ করে। ইহাতে একই গাছে প্রতিবৎসরেই প্রচুর ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পেঁপে গাছের এই উপায়ে পেঁপে ফল জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না, ইহাতে ভালই ফল হইবে আশা করা ভুল হইবে না।।

আমেরিকাবাসীগণ বীজ হইতে চারাইয়া বার বার খেজুর চাষে বিফল হওয়ায়, একজন বৈজ্ঞানিককে উৎকৃষ্টতম খেজুর গাছের জন্মস্থানে খেজুর গাছের রহস্য জানিবার জন্য পাঠান। তিনি আসিয়া খেজুর গাছের তেউড় রহস্য এবং পরাগযোগ কৌশল লক্ষ করিলেন। আলজিরিয়া প্রদেশের বিস্কারায় পৃথিবীর সেরা খেজুর জন্মে। তিনি এইস্থান হইতে উৎকৃষ্ট খেজুরগাছের তেউড় সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়া রোপণ করিলেন। অবশ্য তেউড় পাওয়া সহজ হইলেও পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার মোটেই ছিল না। অতি সাবধানে ও সুকৌশলে তেউড়গুলি ক্যালিফোর্ণিয়ায় লইয়া গিয়া রোপণ করা হইলে যেগুলি বাঁচিয়া গেল উহারা চমৎকার ফলপ্রসূ গাছে পরিণত হইল। এ স্থানেও পরাগযোগ মানুষ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় একই গাছে প্রতি বৎসরই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে লাগিল।

নিয়ন্ত্রিত পরাগযোগ আবিষ্কৃত হওয়ায় মরুবাসী মানুষ দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসী সৈন্যদিগের সহিত মিশরে তুর্কীসৈন্যদিগের যুদ্ধ থাকাকালীন কায়রো নগরীর চতুর্দ্দিকস্থ ভূখণ্ডে চাষীরা নিয়ন্ত্রিত পরাগযোগ করিবার

সুযোগ পাইল না। স্ত্রী-উদ্ভিদ পুষ্পিত হইল, পরাগযোগক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ পরাগযোগ ঘটিল না।

অল্পসংখ্যক রঁাড়া গাছের পরাগ বায়ুবাহিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক পুষ্পিত স্ত্রী-উদ্ভিদের নিকট উপস্থিত হইতে পাইল, ফলে সে বৎসর অধিকাংশ গাছগুলিতে ফলই ধরিল না, উহারা বন্ধ্যাই রহিয়া গেল।

ইরাণে একবার গৃহযুদ্ধে একপক্ষ অপরপক্ষকে পেটে মারিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিয়া উহাদের দেশের রঁাড়াগাছগুলিকে নিঃশেষে কাটিয়া ফেলিল। আক্রান্তপক্ষ এইরূপ বিপদ হইতে পারে বুঝিয়া রঁাড়া গাছ হইতে সময় থাকিতে পরাগপ্রসূডালগুলি কাটিয়া বদ্ধপাত্রে লুকাইয়া রাখিয়া দেয়। শত্রু ধ্বংসকার্য্য সারিয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া যাওয়ার পরে ঐ সংগৃহীত পরাগ বাহির করিয়া স্ত্রী-উদ্ভিদগুলিকে ফলপ্রসূ করিয়া ঐ দেশবাসী ক্ষুধা হইতে বাঁচে।

মরুবাসীদিগের দীর্ঘজীবি খেজুর গাছ অমূল্য সম্পদ বলিলেও চলে। ইহা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা হইতে পুত্র পায়। গাছগুলির সম্পত্তির মতই বেচাকেনা চলে। এমনকি বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে কন্যাপণ স্বরূপ এক বা একাধিক খেজুর গাছ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

(গ) জলসঞ্চয়ী ফণিমনসা গাছ

আমেরিকার এক রৌদ্রদগ্ধ ভূখণ্ডে একপ্রকার সবুজ জন্মে। সবুজ কেমন করিয়া প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য রূপান্তর গ্রহণ করে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন দেশে সাধারণ সবুজ জলের অভাবে বাঁচে না। ঐ দেশে জলের এমনই অভাব যে পাতালে মূল নামাইয়াও সবুজ একবিন্দু জল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার উপর সূর্য্যের প্রখর তেজে পাতাগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী জলই বাষ্পাকারে আকাশে মিলাইতে থাকে বলিয়া গাছ অচিরেই শুকাইয়া মরিয়া যায়।

এইরূপ অবস্থায় সবুজ বাঁচিয়া থাকিবার এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইহা আপন কাণ্ডের স্থূলতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং পাতাগুলিকে কাঁটায় পরিণত করিয়াছে। ফলে পাতার আয়তন ক্ষুদ্রতম হওয়ায় বাষ্পাকারে (জল) উপিয়া যাইবার দ্বারের সংখ্যা ন্যূনতময় দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে সংগৃহীত আহার্য্য পত্ররচনায় ব্যবহৃত না হইয়া কাণ্ডের পুষ্টিতে নিয়োজিত হয়। যখন জল পাওয়া সম্ভব হয়, তখন উহা আপন স্থূল কাণ্ডে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং এই সঞ্চিত জল অভাবের সময় ব্যবহার করে। বিস্তৃত পত্রের সরু কাঁটায় পরিণত হওয়ায় জলের বাহির হইবার ছিদ্রসংখ্যা কমিয়া যায়, ফলে জলের সময় আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হয় এবং জলের অভাব হইলেও অল্প ব্যয়ের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার সুবিধা হয়।

এই সবুজ অনেকটা দেখিতে আমাদের দেশের ফণিমনসা গাছের মতন। ইহার দেহ গোমহিষাদির অতি পুষ্টিকর খাদ্য ; কিন্তু ইহা খাইয়া প্রাণধারণ করিতে গিয়া কাঁটার জন্য পশুকে প্রাণ হারাইতে হয়। ইহার মধ্যে সঞ্চিত আহার্য্য ও জল এইরূপ কাঁটা দিয়া রক্ষিত না হইলে জলের অভাবে ইহারা না মরিলেও পশুতে খাইয়া ইহাদিগকে কবে শেষ করিয়া ফেলিত। প্রকৃতিদেবী এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন ; একদিকে জলাভাব, অন্যদিকে গোমহিষাদির আক্রমণ, এই দুই বিপদ হইতে সবুজকে বাঁচাইয়াছেন।

ঐ অঞ্চলবাসী দেখিল যে ঐরূপ কাঁটাগাছে প্রচুর খাদ্য ও জল থাকা সত্ত্বেও পশুরা কাঁটার জন্য উহা খাইতে পারিতেছে না। ক্রমশঃ যাদুকরের (লুথার বার্বাঙ্ক) দৃষ্টি এদিকে পড়িল। ঐরূপ সবুজের দোষগুলি বাদ দিয়া তিনি কুলীন শ্রেণীর ফণিমনসা সৃষ্টি করিবার সাধনায় লাগিয়া গেলেন।

প্রথমে তিনি এমন গাছ বাছিয়া লইলেন যাহার গায়ে কাঁটা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় অল্প। এইরূপ সবুজ হইতে যে নূতন বংশধারা

উৎপন্ন হইল, উহাদের গায়ে কাঁটা হইল আরও ছোট ও উহার সংখ্যায় হইল পূর্ব্বাপেক্ষা কম। এইরূপে ক্রমশঃ ঐ বংশ ধারার উন্নতি করিতে করিতে, এতদিন ধরিয়া তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, একদিন বাগানে তেমনই একটি গাছ দেখিতে পাইলেন। এই গাছটি উচ্চে প্রায় আট
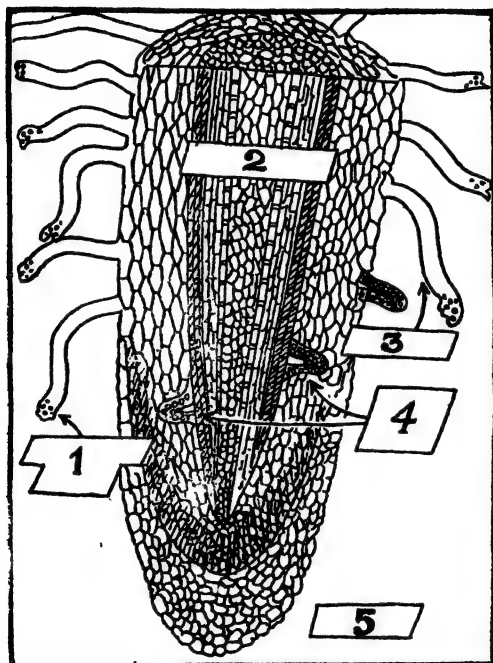
১। রসে গোলা মাটি হইতে খাদ্যকণা সংগ্রহ, ২। জল সরবরাহের নালী-পথ, ৩। মূলকেশ, ৪। কচি পার্শ্বমূল, ৫। মূলের অগ্রভাগ।

ফুট, ইহার কাণ্ড বেশ শাঁসাল ও স্থূল এবং দেহ ছিল একেবারেই নিষ্কণ্টক। ইহা তাঁহার দশবৎসরের নীরবসাধনার ফল, তিনি এই অভূতপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করায় আনন্দে অভিভূত হইলেন। এই নিষ্কণ্টক

গাছ হইতে যে সম্পূর্ণ নূতন বংশধারা প্রবাহিত হইল, উহা হইল সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক, শাঁসাল, স্থূলকাণ্ড ফণিমনসা।

এই কুলীন ফণিমনসার বংশধারা প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে বারিবিরল ভূখণ্ডে পূর্ব্বে গোমহিষাদি রাখা দায় হইত, সে স্থানে উহা রাখা আজকাল অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গাছে আহার ও জল অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়ায় চাষী নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং গোমহিষাদি একাধারে আহার ও পানীয় পাইয়া বাঁচিয়াছে।

উদ্ভিদ-যাদুকরের ইহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার প্রতিভা প্রাণী-জগতের এক শত্রুকে পরম মিত্রে পরিণত করিয়াছে। ইহার শাঁসাল দেহ প্রাণীর আহার ও পানীয় যোগায়, ইহার রসাল ফল মানুষের ক্ষুধা মেটায়। ইহার জীবনযাত্রায় বৃষ্টির প্রয়োজন নাই বলিয়া শুষ্ক অনুর্ব্বরক্ষেত্রেও ইহার চাষ চলিতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণীর ভরণপোষণ চলিতে পারে। ফণিমনসা বাঁচাইবে গো-মহিষাদিকে আর ইহারা বাঁচাইবে মানুষকে।

স্থূলকাণ্ডের শাঁসে প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুবিধা হইল, জলাভাবে যখন মাটিতে একবিন্দু রসও থাকে না তখন এই সঞ্চিত জলে উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকে। পাছে এই অতি কষ্টে সঞ্চিত জল সূর্য্যের প্রখর তেজে উপিয়া যায় সেইজন্য উহার কোমল শাঁসাল জলপূর্ণ অন্তর্দ্দেশ কাঁচের মত শক্ত ও পুরু চকচকে ত্বকে আবৃত থাকে। এই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যতেজ অন্তর্দ্দেশে পৌঁছিতে পারে না।

পাতাকে কাঁটায় পরিণত করিয়া যুগপৎ গো-মহিষাদির আক্রমণ ও জলাভাব হইতে সবুজের বাঁচিবার উপায় হইল বটে, কিন্তু বাঁচিবার জন্য যে আহারের প্রয়োজন তাহা পাক হইবে কোথায়? আকাশ হইতে সংগৃহীত কার্ব্বন-দ্বিঃঅক্সাইড ও আপন অঙ্গে সঞ্চিত জল সৌরতেজে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শ্বেতসার প্রস্তুত করিবার জন্য ক্লোরোফিলের একটা আশ্রয় চাই। পাতা ছিল সেই আশ্রয়, প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ক্লোরোফিলের ঐ আশ্রয় নষ্ট

করিয়া সবুজ আপন ত্বকে ঐরূপ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিল সেইজন্য এই জাতীয় গাছের কাণ্ডাদি দেখিতে সবুজ, অন্য গাছের মত কালচেটে ধূসরবর্ণ নহে। ফলে পাতার স্থলে ছালে এই জাতীয় উদ্ভিদের পাককক্ষ স্থানান্তরিত করিয়া প্রকৃতি উহার খাদ্যের অভাব মিটাইয়াছেন।

পাতা ফেলিয়া দিলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া জল উপিয়া যায় বলিয়া অঙ্গের পৃষ্ঠদেশের কালি (area) কমাইবার জন্য উহা ক্রমশঃ গোলাকার রূপ গ্রহণ করিল। ঘনবস্তুর (solid) মধ্যে গোলকের পৃষ্ঠদেশের কালি সর্ব্বাপেক্ষা কম। ফুটবলের মত আকার গ্রহণ করিতেও ইহাকে কখনও কখনও দেখা যায়, আবার গোল নলের মত আকারও লাভ করে। আমেরিকার আরিজোনা মরুভূমিতে এই নলাকারে ফণিমনসা গাছগুলি ষাটফুট উচ্চ পর্য্যন্ত বাড়িতে দেখা যায়। এইরূপ একটী বিশাল ফণিমনসা গাছ কাটিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ শুকাইতে এক বৎসর সাত মাস লাগিয়াছিল। উহার মধ্যে কতখানি জল সঞ্চিত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।
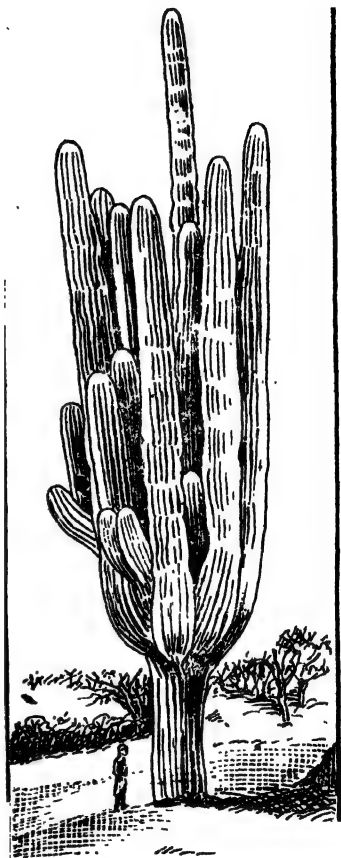
মানুষের তুলনায় গাছটি কত বড়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটা অদ্ভুত কিছুর নিদর্শন স্বরূপ একটা টবে করিয়া ফণিমনসা গাছ আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় আনান হয়। তাহার পর ভাল বেড়া হইতে পারে মনে করিয়া ক্ষেতের ফসল রক্ষা করিবার জন্য ইহাকে ক্ষেতের চারিপাশে লাগান হইল। ইহাও অনুকূল যোগাযোগে অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুযোগ বুঝিয়া রক্ষক না হইয়া ক্ষেতের ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ইহা ক্ষেতের পর ক্ষেত গ্রাস করিয়া উর্ব্বর ক্ষেতগুলিকে ঘন কাঁটাবনে পরিণত করিল। চাষীদিগের মহা বিপদ উপস্থিত হইল, তাহারা এ বিপদে কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না। এই কাঁটা গাছ বৎসরে পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি গ্রাস করিতে লাগিল। ইহা হইতেই এই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

অবশেষে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার ব্যবস্থা হইল। এক জাতীয় কীট এই জাতীয় উদ্ভিদের শাঁস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে দেখিয়া সযত্নে ঐ কীট আমেরিকা হইতে আনান হইল। মানুষে ফণিমনসার সহিত যুদ্ধে প্রায় হারিতে বসিয়াছিল, এমন সময় ঐ কীটের সাহায্য পাওয়ায় সে আবার কাঁটাগ্রস্ত ভূমিগুলি ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়া চাষ করিতে পারিতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা ভূমির পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। কীটের বংশবৃদ্ধি ফণিমনসার অপেক্ষা দ্রুতবেগে হওয়ায় শীঘ্রই উহারা কাঁটাবন পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পর ঐ অগণিত 'ম্যায় ভূখা হুঁ'র দল কি খাইবে? আবার রক্ষক ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইবে কি না তাহাই চিন্তার বিষয়।

(ঘ) আঠালো রবার গাছ

ভূপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের দশ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে রবার গাছ জন্মে। এই অঞ্চলে যেমনি প্রবল বারিপাতের বিরাম নাই,

তেমনি প্রচণ্ড গরমের অবসানও ঘটে না। বারমাসই বৃষ্টি হয়, তবে ছয় মাসেই অত্যধিক মাত্রায় বারিপাত হইতে দেখা যায়। এইরূপ অঞ্চল ঘন বনভূমিতে পূর্ণ। এই বনভূমি মানুষের বাসের পক্ষে বড়ই অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া আদি জ্বরের অবাধ লীলাক্ষেত্র।

এই বিষুববলয়ের অন্তর্গত ব্রেজিল নামক ভূখণ্ডে এই গাছ স্বভাব-জাত অবস্থায় পাওয়া যায়। রবার গাছের বন মানুষ ঐদেশেই প্রথমে

রবার গাছ হইতে রবার সংগ্রহ করা হইতেছে।

দেখিতে পায়। আমাদের দেশে যেমন খেজুর গাছ কাটিয়া রস পাইবার প্রথা আছে, প্রায় অনুরূপভাবেই লোকেরা বন্য রবার গাছ হইতে ঘনরস বাহির করিয়া জমাট রবার সংগ্রহ করে।

এখনও আমাজন নদের অববাহিকার ঘন বনে যে বন্য রবার গাছগুলি জন্মে, উহা হইতে যে রবার লাভ হয়, উহাই হইল পৃথিবীর

উৎকৃষ্টতম প্যারারবার। আমাজন নদের তীরে প্যারা নামে এক জনপদের নামে ঐ রবারের নামকরণ হইয়াছে।

উদ্ভিদ বিদ্যায় জ্ঞান বাড়িবার সঙ্গে মানুষ দেখিল ঐ বন্য রবারের জাতি ভাল হইলে কি হয়, উহারা ঘন বিশৃঙ্খল ভাবে বাড়িয়া উঠায় স্থানাভাবে উহাদিগের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। ফলে রবার গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে রস পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন লোকে বাড়তি গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া জমি পরিষ্কার করিয়া বাকি গাছগুলিকে সুবিন্যস্তরূপে সারিবদ্ধ করিল। এইরূপ ব্যবস্থায় আলোহাওয়া ও স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়ায় প্রত্যেক গাছটি প্রচুর খাদ্য পাইতে লাগিল। তখন দেখা গেল প্রতি গাছই পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ ঘনরস দান করিতে সক্ষম।

পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রেজিলেই রবার গাছ জন্মিত। তখন ইহা অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হওয়ায় উক্ত বৃক্ষের বীজ পাছে অন্য দেশে লইয়া গিয়া লোকে ইহার চাষ করে, সেইজন্য বিশেষ সাবধানের সহিত ইহাকে রক্ষা করা হইত। কাহাকেও রবারবনে প্রবেশ করিয়া বীজসংগ্রহ করিতে দেওয়া হইত না।

১৮৭৬ খৃঃ একজন ইংরাজ নিজে সম্পূর্ণ একখানি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া দেশভ্রমণ ও শিকারের ছলে আমাজন নদ ধরিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং ঐ স্থান হইতে রবার গাছের উৎকৃষ্টবীজ কয়েক বস্তা জাহাজের খোলে লুকাইয়া লইয়া আসেন। তাহার পর বিলাতের কিউ (Kew Botanical garden) উদ্যানে ঐ বীজ সাবধানে চারাইয়া রবার গাছ পান।

যে স্থানে স্বভাবজাত রবার গাছ জন্মে, ঐ স্থান ভূপৃষ্ঠের যে বলয়ে অবস্থিত, ঐ বলয়ের মধ্যে যে কোন স্থানেই এই গাছ জন্মিয়া বাঁচিতে পারে। এসিয়ার দক্ষিণে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও

নিউগিনি, সিংহল ও ভারতের দক্ষিণাংশে রবার গাছের চাষ হইলে ভাল ফলই পাওয়া সম্ভব। কিউ উদ্যানে চারান ঐ রবার চারাগুলি মালয় প্রভৃতি ভূখণ্ডের বর্ত্তমান রবার গাছগুলির পূর্ব্বপুরুষ।

মালয় আদি যে সকল ভূখণ্ড হইতে আজ লক্ষ লক্ষ মণ রবার বিদেশে চালান যায়, ঐ স্থানগুলি রবার চাষের পূর্ব্বে ছিল ঘন বনে আচ্ছন্ন এবং অজগর আদি সর্প ও ব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুর মনোরম লীলাভূমি। এখন মালয় প্রদেশের অধিকাংশ ভূমিতে সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য উচ্চ রবার গাছ দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

রবার ব্যতীত মোটর গাড়ীর টায়ার হইতে আরম্ভ করিয়া গরম জলের বোতল, আইসব্যাগ প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত করা সম্ভব হইত না। এত সাধের ফুটবল খেলার কল্পনাও লোকে করিতে পারিত না। একটা ফাউনণ্টেন পেন ব্যবহার করিবার সময় মনে রাখিও উহার খোলটি রবার হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

এইরূপ বনেই আর দুইটি গাছ জন্মে, উহাদের মধ্যে একটি কোকো, ইহা দেয় মানুষকে পুষ্টিকর পানীয়। শীতপ্রধান দেশের পক্ষে এই পানীয় বড়ই উপযোগী। ইহা পান করিলে অতি শীতেও শরীর বেশ গরম থাকে। আর একটি গাছের নাম সিনকোনা, ইহার ছালের কাথ হইতে জ্বরের ঔষধ কুইনিন মানুষ পাইয়াছে। যে দেশের দূষিত আবহাওয়ায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব, সেই দেশেই জ্বরের ঔষধের ব্যবস্থা প্রকৃতি দেবী করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার সৃষ্টিতে সাম্য বজায় রাখিবার নীতি অনুযায়ীই সম্ভব হইয়াছে।

(৬) নারিকেল গাছ

খেজুরের দেশের এক ভদ্রলোক নারিকেল ফল দেখিয়া বলিয়াছিলেন মানুষের জন্য একাধারে দুইখানি রুটি ও জলের ব্যবস্থা ভগবান

করিয়াছেন। কথাটীতে মোটেই অত্যুক্তি নাই। বোধ হয় এমন ফল একটিও নাই। নারিকেল গাছের প্রত্যেক অংশটি কাজে লাগে। ইহার ফলে তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার আহার্য্য একাধারেই পাওয়া যায়। মালাটিতে হুঁকার খোল ও কোটের বোতাম হয়। গরীব লোকেরা নারিকেল মালা অর্দ্ধাংশ বাটিরূপে ব্যবহার করে। ইহার ছোবড়ায় দড়ি, পাপোষ, গালচে ইত্যাদি বহু প্রকারের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার পাতায় ঘর ছাওয়া চলে, পাতার কাঠিতে ভাল ঝাঁটা হয়, পাতার ডাঁটা কাটিয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা চলে। যে দেশে নারিকেল গাছ ছাড়া অন্য ভাল গাছ জন্মে না, ঐ দেশের লোকেরা নারিকেল গাছের গুঁড়ি চিরিয়া তক্তা করিয়া নানা কাজে ব্যবহার করে।

নারিকেলের শাঁষ শুকাইয়া ঘানিতে পিষিয়া খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এক তৈল পাওয়া যায়। টাটকা ঘানির তৈলে লুচি ভাজিয়া খাইলে খুব সুস্বাদু ও রুচিকর লাগে। দাক্ষিণাত্যে সরিষার তৈলের স্থানে নারিকেল তৈলের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের রন্ধন কার্য্যে নারিকেল তৈল অপরিহার্য্য। সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। হাইড্রোজেন সহযোগে ইহাকে জমাট করিয়া ঘৃতের মত দেখিতে এক প্রকার পদার্থে পরিণত করা হয়। ইয়োরোপে নারিকেল তৈলের সহিত উৎকৃষ্ট চর্ব্বি ও সামান্য মাখন ফেঁটাইয়া নকল মাখম (margarine) প্রস্তুত করা হয়। সে দেশের গরীব জনসাধারণ মাখমের স্থলে এই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। এই তৈল ক্ষার সংযোগে ছানার মত কাটাইয়া সাবান প্রস্তুত করিবার সময় গ্লিসারিন উপজাত (by product) হিসাবে পাওয়া যায়। এই গ্লিসারিণ আজকাল অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

এই গাছের এত যে আদর ইহার কারণ প্রত্যহই আমরা ইহার

কোন না কোন অংশ ব্যবহার করি। প্রতি অংশটি কাজে লাগায় ইহার শত্রুও বহু। এক হিসাবে মানুষ ইহার পরম শত্রু, তবে সে বুদ্ধিমান বলিয়া ইহার চাষ করিয়া প্রকৃতিকে উহার বংশধারা রক্ষায় সাহায্য করে। ইহার ফল এমনি সুস্বাদু যে পশু পক্ষী মানুষ সকলেরই অতি প্রিয়। বানরে সুবিধা পাইলেই ইহা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া খায়। একপ্রকার সামুদ্রিক ডাকাতে কাঁকড়া আছে উহারা গাছে উঠিয়া আপন দৃঢ় দাঁড়ার সাহায্যে নারিকেলের ছোবড়া ভেদ করিয়া উহার চোকের মধ্য দিয়া উহা চালাইয়া দিয়া শাঁষ কুরিয়া কুরিয়া খায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলাভূমিতে বিশুদ্ধ পানীয় একেবারেই দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। সে স্থানে নারিকেল গাছ মাটি হইতে দূষিত জল সংগ্রহ করিয়া আপন কোষে কোষে ছাঁকিয়া, পরিষ্কার করিয়া আপন ফলের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই জল অতি বিশুদ্ধ, রুচিকর এবং রোগীর পথ্য। এইরূপ ফলের চাহিদা হওয়াই স্বাভাবিক। পাছে সকলের লোভের ফলে এমন গাছের বংশধারা সমূলে লোপ পায়, সেই ভয়ে প্রকৃতি দেবী সাধ্যমত ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

গাছটি অনুকূল ক্ষেত্রে বাড়িতে বাড়িতে ষাট হাতেরও উচ্চে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। পাম গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য বংশধারার মত ইহার কোন শাখা জন্মে না। একেবারে মাথায় ঝুঁটির মত কয়েকটি দীর্ঘাকার পাতা জন্মে। গাছের বাড়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পাতাগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতে থকে এবং কাণ্ডের গায়ে আপনাদিগের পরিচয় স্বরূপ কয়েকটি দাগ মাত্র রাখিয়া যায়। এই পাতাগুলির মাঝে মাছে কাণ্ডের গা হইতেই কয়েকটি ফুলের শাখা বাহির হয়। এই শাখায় সাদা সাদা ফুল ধরে। কালে এই ফুলগুলি ফলে পরিণত হইয়া এক একটি গুচ্ছে ঝুলিতে থাকে। বৎসরে দুইবার ফল ধরে এবং একটি ভাল গাছে

অন্ততঃ শতাধিক ফল পাওয়া যায়। এইরূপ একশত নারিকেল গাছ থাকিলে একটি গৃহস্থের বেশ সুখেই দিন চলিয়া যাইতে পারে।

স্বভাবজাত ফল পাকিয়া অত উচ্চ হইতে মাটিতে পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে বীজ হইতে চারা জন্মিবে না, এই আশঙ্কায় প্রকৃতি দেবী মালার উপর নরম ছোবড়ার গদির মত প্রচুর বাঁধন দিয়াছেন। এইরূপ স্প্রীংএর মত ব্যবস্থায় ফলটি নীচে পড়িলে প্রায়ই আঘাত প্রাপ্ত হয় না এবং ভবিষ্যতে ফলমধ্যস্থ বীজের চারাইবার পক্ষে কোনই অসুবিধা থাকে না।
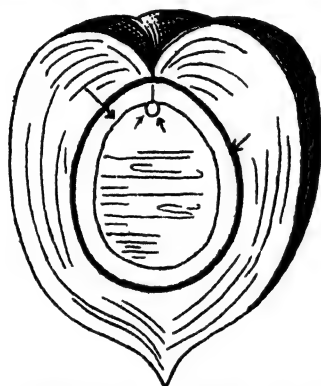
নারিকেলকে আধাআধি চিরিলে যেরূপ দেখায়।

বীজ কোথায় গিয়া কবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবে তাহার ঠিকানা না থাকায় ভ্রূণের আহারের জন্য শাঁষ ও প্রচুর জলের ব্যবস্থা করিতে প্রকৃতিদেবী ভুলেন নাই। ভ্রূণের এই আহার ও জল ধারণের উপযুক্ত আধার গড়িতে গিয়া মালাটি অতি কঠিন করিতে হইয়াছে। আবার পাছে মালাটি অত উচ্চ হইতে পড়িয়া ফাটিয়া যায়, সেই জন্য উহার উপরে প্রচুর ছোবড়ার গদির মত ব্যবস্থা করিয়া উহাকে শক্ত ছাল দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। এইরূপ নিখুঁত ব্যবস্থার ফলে মানুষ ব্যতীত অল্প জীবই উহাকে নষ্ট করিতে পারে। এত

ব্যবস্থা না থাকিলে এমন সুস্বাদু ও রুচিকর ফলের বংশধারা পৃথিবীতে আজ বাঁচিয়া থাকিত কিনা সন্দেহ।

প্রকৃতির সুকৌশল ব্যবস্থাগুণে বীজ অঙ্কুরিত হইবার ক্ষণের অপেক্ষায় মালার মধ্যে নিরাপদে বাঁচিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভ্রূণ জাগিয়া বীজস্থ আহার ও পানীয় নিঃশেষে গ্রহণ করিয়া ফেলিলে দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবে কি করিয়া? এই দৃঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া যাহাতে সময় হইলে ভ্রূণ বাহিরে আসিয়া আহার সংগ্রহ করিয়া বাঁচিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও প্রকৃতি দেবী করিয়াছেন।

মালার এক প্রান্তে তিনটি চোকের মত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে দুইটির ফাঁক একেবারে বন্ধ, মাত্র দাগ দেখিয়া লোকে ভুল করে। বাকিটি দিয়া ভ্রূণ বাহির হইয়া আসিয়া পল্লবিত হয়। ভ্রূণের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ভ্রূণটি মালার মধ্যে বাড়িতে আরম্ভ করে এবং বাড়িবার মুখে নারিকেলের রসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া ক্রমশঃ সারা মালাটায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় নারিকেলের ফোঁপল হইয়াছে লোকে বলে। তালের আঁটি হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ঠিক এই অবস্থা ঘটে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষীণ পল্লব মালার ঐ ফাঁকটুকু দিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অংশ ভবিষ্যতে গাছের কাণ্ড ও পত্রে পরিণত হয়। ভিতরে ভ্রূণ হইতে কয়েকটি শুঁড় বাহির হইয়া মালার অবশিষ্ট রসটুকু গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ গাছের মূলে পরিণত হয়। বাহিরে চারাটির বাড়ের সঙ্গে সঙ্গে মালার ভিতরের ফোঁপল মালার সব শাঁষটুকু আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে মালার বাহিরে কচি গাছটিতে পত্র বিকশিত হওয়ায় এবং কচি মূল পচা মালা ঠেলিয়া মাটিতে প্রবেশ করিতে পারায়, উহা সূর্য্যতেজের সাহায্যে আহার্য্য পাক করিয়া লইতে সক্ষম হয়।

একটি চোক হইলেই যখন কাজ চলে, তখন আর দুইটি দাগ কিসের?

মনে হয় এই বংশধারার প্রথম পর্ব্বে একটি মালায় তিনটী কয়িয়া ভ্রূণ জন্মিবার ব্যবস্থা ছিল। সেইজন্য তিনটি ভ্রূণের বাহিরে আসিবার জন্য তিনটি পৃথক দ্বারের ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতি দেবী তখন বোধ হয় বীজরক্ষার ব্যবস্থা বর্ত্তমানের মত দৃঢ় ও কার্য্যকর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্য একটি মালায় তিনটি বীজ জন্মাইয়া সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন বীজরক্ষার মালা ছোবড়া ও খোসা, এই তিনটি রক্ষাকবচ বেশ দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে তখন একটি মালায় একাধিক বীজ রাখিবার আর কোন প্রয়োজনীয়তা রহিল না। তখন হইতে মালার মধ্যে একটি মাত্র বীজ জন্মিতে লাগিল এবং মালার দুইটি দাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাই পূর্ব্বের সেই দুইটীদ্বারের দাগ আজও মালার গায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনটির আহার্য্য একটি ভ্রূণ গ্রহণ করিতে পারায় ভ্রূণের বাঁচিবার শক্তি পূর্ব্বের তিনগুণ হইল এবং মালার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার আয়ুস্কালও বৃদ্ধি পাইল।

নারিকেল দেখিতে এত বড় হইলেও জলের তুলনায় লঘু। সমুদ্রোপ-কূলে নারিকেল গাছ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। উহার কারণ নারিকেল জলে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে ডাঙ্গায় আশ্রয় পাইলে সেই স্থানে কালে অনুকূল যোগাযোগে উহা হইতে গাছ জন্মে। এই কারণেই চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত প্রবালদ্বীপে আর কোন গাছ নাই, কেবল মাত্র নারিকেল গাছ সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোন বীজ লোনাজলে ভাসিয়া বেড়াইয়া বেশী দিন বাঁচিতেই পারে না, নারিকেল বীজের যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকায় বহুদিন জলে ভাসিয়া বেড়াইলেও ভ্রূণের প্রাণশক্তির কোন ক্ষতি হয় না।